রামমোহন / উত্তরপক্ষ

অরবিন্দ পোদ্দার

উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত
রামমোহন রায় স্মারক বক্তৃতামালা (১৯৮১)

বাংলার রেনেসাঁস ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় রামমোহন ৯
রামমোহনের রাজনীতি ২৭
উত্তরকালের দৃষ্টিতে রামমোহন ৪৪

বক্তৃতার বিষয়বস্তু যদিচ স্বতন্ত্র, তথাপি যুক্তির বিস্তার ও বিশ্লেষণের বাধ্য-বাধকতায় কোন কোন তথ্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু, যেহেতু প্রতিটি বক্তৃতাই স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেহেতু তাদের সংহত কাঠামো অক্ষত রাখার জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়েও কোনরূপ সম্পাদনা করা হলো না। আশা করি, যুক্তি-পারম্পর্যের কথা স্মরণে রেখে সহৃদয় পাঠক তা গ্রহণ করবেন।

আমার বিশেষ প্রীতিভাজন শ্রীপ্রদীপ রায়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। পাণ্ডুলিপি স্তরে, তিনি সেগুলো পাঠ করেছিলেন, এবং কোন কোন বিষয়ে কিছু সুপারিশও করেছিলেন। তাঁর প্রতি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো। ডঃ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহযোগিতাব কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি; যদিচ আদর্শগত বিশ্বাস ও প্রেক্ষিতের দিক থেকে আমরা বিপরীত মেরুতে স্থিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দান করে আমাকে বাধিত করেছেন।

বক্তৃতা শ্রবণের জন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি বিনীত নমস্কার জানাই।

অরবিন্দ পোদ্দার

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ :

বঙ্কিমমানস
ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক
মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ
রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব
রবীন্দ্রমানস
শিল্পদৃষ্টি
আধুনিক উপন্যাসে মানবপ্রত্যয়
আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চেতনা
ইংরেজি সাহিত্য পরিচয়
Renaissance in Bengal : Quests and Confrontations (1800—1860)
Renaissance in Bengal : Search for Identity (1861—1910) ইত্যাদি।

বাংলার রেনেসাঁস ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় রামমোহন

আধুনিক শিল্পসভ্যতার মানদণ্ডে অনগ্রসর কোন সমাজে যখন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন অবশ্যম্ভাবী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, ঐ সমাজ পূর্বোক্ত মানদণ্ডে অগ্রসর অথবা প্রগতিশীল কোন রাষ্ট্রের সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছে। অথবা, বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসঙ্গটিকে এভাবেও উত্থাপন করা যায় যে, যখনই অ-সম বিবর্তনের স্তরে স্থিত দুটি রাষ্ট্র অথবা সমাজ সংঘাত-সংযোগের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তখন অনগ্রসর সমাজে বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সামাজিক প্রাঙ্গণে যে উপপ্লাবী এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাহলো একটি জীবন্মৃত সভ্যতার উপর পাশ্চাত্ত্যের একটি গতিশীল আগ্রাসী সভ্যতার আক্রমণ। [জাতি বা রাষ্ট্রের নামে ঐ সভ্যতার প্রতিনিধিদের এখানে চিহ্নিত করা হলো না।] ফলে, দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জীবনদর্শন ও বিশ্ববোধের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার গরজ যে জটিল ভাবাবর্তের সৃষ্টি করে, তা অতিশয় প্রত্যাশিতভাবেই আধুনিক বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাবের জন্য জমি কর্ষণ করে।

প্রসঙ্গটিকে অন্য ভাবেও উপস্থিত করা যায়। অর্থনৈতিক উৎপাদনে নির্দিষ্ট ভূমিকাসহ কোন শ্রেণী যখন ইতিহাসের কোন স্তরে বিবর্তিত হয়, তখন যুগপৎ এক বা একাধিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীরও আবির্ভাব ঘটে, যারা ঐ শ্রেণীর ভাবাদর্শ প্রচার করে, বিশ্লেষণ করে তার কর্মকাণ্ড। সামাজিক-রাষ্ট্রিক যাবতীয় কর্মেই বুদ্ধিজীবীরা সেই শ্রেণীকে সবর্ণতার বোধে ও আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ করে। উদাহরণ স্বরূপ, ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর তাত্ত্বিক পণ্ডিতবর্গেরও অভ্যুদয় দেখা গিয়েছিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার পথে ইংরেজ শাসকবর্গ ও তাঁদের পশ্চাতে অবস্থিত ইংরেজ ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে ভারতীয় নব-ধনিক ও নতুন ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং সামাজিক ক্রমের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের আদর্শের প্রবক্তা বুদ্ধিজীবীদেরও যে আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। বিত্তবানদের বিত্ত আর বুদ্ধিজীবীর মেধা, এই দুটি স্তম্ভের উপর

দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তার তথাকথিত প্রগতিশীলতার বাণী প্রচার করেছিল। এ থেকে আরও একটি সত্য উদ্‌ভাসিত হয় যে বিত্তের যেমন, মেধারও তেমনি সমাজ-রূপান্তরে একটি কার্যকর অথবা ফাংশাগ্যাল ভূমিকা থাকে। আবার কখনও কখনও এই আশ্চর্য ঘটনাও দেখা যায়, বিত্ত এবং মেধা একই ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত, একই ব্যক্তির যুগল ভূমিকা। যেমন রামমোহন রায়ের।

পূর্ব-কথিত কর্ষণেরই ফসল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রাঙ্গণে রামমোহন রায়ের কণ্ঠস্বর ও কর্ম।

এইরূপ বিচিত্র পরিবেশে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার স্বরূপ কি, এবং তাদের চারিত্র বৈশিষ্ট্যই বা কি, সে প্রসঙ্গে দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা নিবেদন করা যাক। অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবী প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সংঘাতকালীন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় বুদ্ধিজীবীদের মানবীয় ট্রান্সফরমার বলে অভিহিত করেছিলেন। এই সংজ্ঞা দ্বারা তিনি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, একটি যান্ত্রিক ট্রান্স-ফরমার যেমন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ গ্রহণ করে, বুদ্ধিজীবীরাও তেমনি এক ভুবন থেকে আহরিত ধ্যানধারণা ভাবাদর্শ ইত্যাদি অন্য এক ভুবনে সঞ্চালিত করেন। সমস্ত ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত ও সমাজতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে একমত যে, এই বুদ্ধিজীবীরা হলেন ভাবাদর্শের প্রসার ও সঞ্চরণের মাধ্যম। সমাজক্রান্তির লগ্নে তাঁরা গ্রহণ করেন সংযোগ স্থাপয়িতার ভূমিকা। সেই ভূমিকা সাধ্যমত পালনের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তিতার বোধে, নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম ও মানস জীবনের ক্ষেত্র কর্ষণ করেন। মানবিক ইতিহাসের এক বন্দর থেকে অন্য এক বন্দরে যাত্রার পথে সুউচ্চ ভাবরাশির অবদান অপরিসীম—সর্বস্তরের এবং সব মানুষই তা স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু, এই সাধারণ সত্যের অন্তর্গত থেকেও বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁরা ঐ প্রত্যয়কে অনুভব করেন আপন অন্তরে, সত্তার সামগ্রিকতায়। সত্তার এই আকৃতি থেকেই এই বিশ্বাসে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন যে, যে ঐতিহাসিক লগ্নে তাঁদের জীবন বিধৃত সেই লগ্নের বিবেককে, মানবিক বোধের সঞ্চয়কে, মানবিক প্রত্যাশাকে তাঁরা সর্ববিধ আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন; তাঁদের এই আত্মবিশ্বাস যে সেই কাল যেসব রাষ্ট্রিক সামাজিক নৈতিক সমস্যায় আলোড়িত, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিত, বিকল্প ব্যবস্থার সম্ভাবনাময়তার আশ্বাস, অনাগত সমৃদ্ধির বাণী, ইত্যাদি প্রতি-

শ্রুতির জন্য সেকালের মানুষ তাঁদের উপরই নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎ কালের রূপকার হিসাবে তাঁদের ভূমিকা পথিকৃতের—এই বিশ্বাস তাঁদের বক্তব্য ও রচনাতে আনে অসামান্য শক্তি ও গতিপ্রাণতা।

এই সাধারণ ও স্বীকৃত সূত্র অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে রামমোহনের আত্মপ্রকাশের মধ্যেও সেই একই আত্যন্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ, দেড় শত বৎসরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, যুক্তি তর্ক বিসম্বাদ, সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে তাঁর আমলের কলকাতা তাঁরই চিন্তা মনন কর্ম ও ব্যক্তিত্বের দাপটে সচকিত হয়েছিল। অবশ্য, কলকাতা নামক যে এক নব-উন্মেষিত অভিনব ভৌগোলিক সত্তা তা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। মার্ক্সের বন্ধু সহকর্মী ও সহ-চিন্তানায়ক এঙ্গেলস্ ইওরোপীয় রেনেসাঁসকালীন যুগবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার সহায়তায় তৎকালীন কলকাতার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, সেটা ছিল এমন এক কাল যার দাবি ছিল বিরাট পুরুষের আর সৃষ্টিও করেছিল বিরাট পুরুষ, চিন্তায়, আবেগে, চরিত্রে, বিশ্বজনীনতায় এবং পাণ্ডিত্যে। [a time which called for giants and produced giants—giants in power of thought, passion, and character, in universality and learning.] কলকাতার আন্তর গরজও ছিল তাই। সে ছিল এক অভিনব সত্তা, একটি অস্থির অনুভব, বহুধা তাড়িত একটি চঞ্চল বিস্ময়। বহু দেশের বহু বিচিত্র মানুষের পদসঞ্চারে তার অন্তর কম্পিত হচ্ছিল। সেখানে "বাংলার পরিচিত জাতিগুলো ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নানান জাতি ও বর্ণের লোক সমাগম তো ছিলই, আরও ছিল ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, ইহুদি, মার্কিন, এমন কি কিছু সুইডিশ নাগরিকের আসা যাওয়া। ছিল আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং চীন থেকে আগত ভাগ্যান্বেষীর দল। এমনি ভাবে কলকাতা অঙ্গে ধারণ করে অদৃষ্টপূর্ব অঙ্গাবরণ, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব কাকলী, এবং হৃদয়স্পন্দনে অননুভূতপূর্ব অনুভব।" এই কলকাতাই ছিল রামমোহনের কর্মের এবং আদর্শগত যুক্তিবিচার ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু।

ইংরেজ বিজয়ের ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন ইওরোপীয় যুক্তিবাদী মননের যে অভিঘাত ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর অনুভূত হয়, তা সংবেদনশীল চিত্তে অনুকূল সাড়া জাগায়। অদৃষ্টবাদী চিন্তা, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, নিয়তিনির্দিষ্ট বৃত্তে সর্বতোভাবে সকলকে আবদ্ধ করে রাখার যে

মানসিক অবসন্নতা যুগ যুগ ধরে বহমান ছিল, তার কবল থেকে মুক্তিলাভ করার এক অস্থির প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশ প্রশাসনের ব্যবহারিক গরজের পীড়নও পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। অন্যান্য অনেকের মত রামমোহনও নিশ্চয়ই এমনি ধরনের এক মানস-বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়েছিলেন। নতুবা ১৮০৩ / ১৮০৪ সনে প্রত্যক্ষ কোন প্ররোচনা অথবা কোনপ্রকার বিরোধ সংঘাত ব্যতিরেকেই তিনি "তুহ্ ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্" রচনা ও প্রকাশ করবেন কেন। এই প্রথম রচনাতেই দেখা যায়, একটি সুস্থ সংহত যুক্তিবাদী মন সত্য নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষায় একেশ্বরবাদে আশ্রিত ব্যক্তিদের একটি সংগ্রামী আয়ুধ উপহার দিচ্ছে। তাঁর শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তিনির্ভর মননশীলতার একটি-দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক। যুক্তিবাদের সার্থকতা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "যে বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই, যা যুক্তিবিরুদ্ধ, তা একজন যুক্তিবাদী কি করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন? 'যাদের চোখ আছে, তারা এ থেকেই সাবধান হও'।" অন্যত্র বলছেন, "প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন তার মধ্যে এই ভাব নিহিত যে অন্য নিম্নস্তরের জীবের মত স্বজাতীয়ের দৃষ্টান্ত চরম অনুকরণ করা উচিত নয়। পরন্তু নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালমন্দ এমনভাবে বিচার করা চাই যাতে ঈশ্বরদত্ত এই মহামূল্য দান যেন অকেজো করে ফেলা না হয়।" গ্রন্থের উপসংহারের দিকে একেশ্বরবাদের ভিত্তি সংখ্যায় নয়, সত্যে—এই প্রত্যয় ঘোষণা করে তিনি বলছেন, "জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা।" এই সব উক্তি থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, রামমোহন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের গোড়াতেই আমাদের উত্তরাধিকার বলে স্বীকৃত নানাপ্রকার যুক্তিহীন চিন্তা ও আচরণের সীমা লঙ্ঘন করেছেন, এবং অন্য এক দৃষ্টিতে উত্তরাধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। মানুষের মানস-প্রকরণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই এই, যতই সে আপন অভিজ্ঞতার পরিধি অতিক্রম করে, বহু জাতির বিচিত্র মানুষের মধ্যে অনুভবগত ও উপলব্ধিগত ঐক্য অনুভব করে, ততই সে বিরোধ উত্তীর্ণ হয় এবং মানবিক ঐক্যে এবং মানুষের কল্পিত সৃষ্টিকর্তার একত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। যাই হোক, ফার্সি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সংঘাতের আবর্তে রামমোহনের প্রাথমিক সাড়া, তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। সম্ভবত তাঁর ভাবী সংগ্রামেরও দ্যোতক। আর, এ থেকে এ সিদ্ধান্তও অসঙ্গত নয় যে,

এই গ্রন্থের শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী বৈশিষ্ট্য তাঁর মনস্কতার অনায়াসলক্ষ্য গুণ। পরবর্তীকালে শাস্ত্র অবলম্বন করে তিনি যখন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখনও আপন বক্তব্যের একটি যুক্তিবাদী কাঠামো নির্মাণের প্রতি তাঁকে যত্নবান হতে দেখা যায়।

সেই সংগ্রামের জন্য, বিশেষত ধর্মবিশ্বাসগত সংগ্রামের জন্য, তিনি যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, তা বিস্ময়ে অভিভূত করে। এমন কি, তিনি যখন বিতর্কের গভীরে নিমগ্ন, তখনও, ঐ ব্যস্ততার মধ্যেও, তিনি নতুন নতুন ভাষা শিক্ষার সময় খুঁজে পেয়েছেন। স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের সাক্ষ্য অনুযায়ী রামমোহন অল্পবিস্তর দশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর কৈশোরের শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে তাঁর প্রবেশাধিকার ঘটে; ঐ দুই ভাষায় তিনি প্ল্যাটো এবং আরিস্টটলের যুক্তিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন। এরপর কাশীতে অধ্যয়ন করেন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি; ব্যবহারিক গরজ ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অনিবার্য করে তুলে, অপর পক্ষে ধর্মীয় সত্যানুসন্ধিৎসায় হিব্রু ও গ্রীক অবশ্য শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে—এই দুই ভাষায় তিনি বাইবেল পাঠ করেন। আর, জীবনের শেষ দিকে, ফরাসী বিপ্লবের প্রতি আদর্শগত শ্রদ্ধার আকর্ষণে তিনি ফরাসী ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলা এবং হিন্দুস্থানী তো ছিলই, ছিল লাটিন ভাষার চর্চা। বলা বাহুল্য, কয়েকটি ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের।

নানাবিধ বৈষয়িক কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এমন একাগ্রভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা সত্যই বিস্ময়কর; বিশেষত ঐ সময়ে যখন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রসারিত করার মনোভঙ্গি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠেনি। আর, তা এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর যিনি ঐ ঐতিহাসিক লগ্নে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে অস্তিত্বশীল হলেও জীবনের সামগ্রিক প্রাঙ্গণে এভাবে নিজেকে প্রসারিত করার যে অভিযান, তা সৃজ্যমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের মতই দিগন্তপ্রসারী। তিনি যে জ্ঞান সঞ্চয় করেন তা যথাসম্ভব মূল উৎস থেকেই সংগ্রহ করেছেন। সেই জ্ঞান তাঁকে বুদ্ধিমার্গীয় এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে যে, সামাজিক ও মানবিক অস্তিত্বের আপাত বিসদৃশ ও সংযোগবিহীন খণ্ড খণ্ড ঘটনা প্রকৃতপক্ষে এক অখণ্ড ঐক্য-সূত্রে বাঁধা; এবং সেই উপলব্ধিতে আধুনিক যুগের বিশ্বমানবিক অস্তিত্বও মূলগত-ভাবে অবিচ্ছেদ্য। এই জ্ঞান তাঁকে কালসম্মত নয় এমন অবক্ষয়ী মনোভঙ্গি ও

আচার-আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। আর, জ্ঞানসঞ্চয়ই ছিল তাঁর নিকট সংগ্রামের, সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পূর্বসর্ত। একথা সুবিদিত যে, তাঁর সংগ্রাম কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত। যুগের আবর্ত থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় ও আদর্শ জিজ্ঞাসায় যুগপৎ ব্যাপৃত থাকায় শক্তিধর যে ব্যক্তিত্ব তাঁর বুদ্ধিমার্গীয় প্রস্তুতি ও উদ্দীপনা কী বিপুল ছিল, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

সেই উদ্দীপনায়ই তিনি লিখেছেন অজস্র, শাস্ত্রবিচার বাদানুবাদ বিতর্কে যোগদান করেছেন অক্লান্তভাবে, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্থাপন করেছেন মুদ্রণালয়, সহকর্মীদের সঙ্গে আদর্শগত বন্ধুতায় সংঘবদ্ধ হয়েছেন, বিভিন্ন দাবি ও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দিয়েছেন স্মারকপত্র, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিতও করেছেন —অন্য কথায়, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক যুক্তিবাদী ভাবাবর্ত যা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিকে বিপুল আক্রমণে বিদ্ধ ও জর্জরিত করেছিল। বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত তাঁর পুস্তক ও ইস্তাহারের সংখ্যা ষাটের উর্ধ্বে, এর মধ্যে কিছু সংখ্যক আবার হিন্দুস্থানীতে অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি এককভাবে বহন করেছিলেন, এবং সবগুলোই বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস যখন তাঁর "ফাইন্যাল আপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক" মুদ্রণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপন করেন (ইউনিটারি প্রেস), এবং উক্ত পুস্তিকাটি সেখানেই মুদ্রিত হয়। ক্যালকাটা জারনাল-এর সম্পাদক বাকিংহামের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, রামমোহন অ্যাডামের সহযোগিতায় স্থাপন করেন ইউনিটারি চার্চ; এই গীর্জার এবং ইউনিটারি প্রেস, ও পুস্তকাদি প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় থেকেই নির্বাহ করতেন। তার উপর ছিল কিছু বদান্যতা।

সমকালীন ইওরোপীয়গণ বিতর্কে তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন; তা সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে যা সর্বাধিক আকর্ষণীয় তাহলো, যে কোন জাতির ও ভাষাভাষীর, যে কোন পদমর্যাদার এবং যে কোন বিষয়কর্মে নিযুক্ত হোক না কেন, সর্ব স্তরের মানুষের সঙ্গেই সংলাপে তাঁর চাতুর্য ও দক্ষতা ছিল, সেকালীন পরিবেশে, তুলনাহীন। সে ক্ষেত্রে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর যাত্রা যেমন ছিল সাবলীল, ভাষা থেকে ভাষান্তরে যাতায়াতও তেমনি ছিল

স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে অনবদ্য। অধীত বিদ্যাকে নখাগ্রে প্রস্তুত রাখার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। ফলে, যুৎসই দৃষ্টান্তের উল্লেখে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করা তাঁর নিকট কোন একটা সমস্যাই ছিল না। এইরূপ একজন বিদগ্ধ, যুগোপযোগী চিন্তার অনুশীলনে আগ্রহী, এবং ইতিহাসের প্রবাহকে আপন চিন্তামনন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার সংকল্পে অটল মানুষ যে ঐ সময়কার কলকাতায় অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। স্থানীয় ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, ইওরোপীয় পর্যটকদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন; অপর পক্ষে তিনিও কিছু সংখ্যক বিদেশী গুণীজনের সঙ্গে পত্রালাপে মত বিনিময় করতেন, ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে বেন্থামের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ এবং সাক্ষাৎও হয়েছিল। জন ডিগবি লিখেছেন, রামমোহন ইংরেজি সংবাদপত্রের ছিলেন ক্লান্তিহীন পাঠক, এবং তাঁর নিকট সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ইওরোপীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। ১৮২৯ সনে ফরাসী প্রকৃতি বিজ্ঞানী জাকমঁ যখন কলকাতায় রামমোহনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন, তখন তিনি ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে রামমোহনের জ্ঞানের যথাযথতায় ও বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এসব ঘটনার এই সংকেত যে, ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি সামগ্রিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

আদর্শ বিচারে তিনি যে প্রেক্ষিত গ্রহণ করতেন তা সবিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি যথাসাধ্য যুক্তিআশ্রয়ী মনস্কতা দ্বারা পরিচালিত হতে চেয়েছেন; এবং যদিচ বিদ্রূপ পরিহার করা তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হয় নি, তথাপি গাল-মন্দের ভাষা যে যুক্তি নয়, এ কথা বহুবার তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার"-এর ভূমিকায় তিনি লিখছেন, "ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব।" আর উপসংহারে প্রার্থনা করেছেন,"হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত্ত করাইবে না ওঁ তৎ সৎ।" এখানে বুদ্ধিমার্গীয় আলোচনায় যুক্তিপরম্পরার বিশুদ্ধতা রক্ষার আগ্রহ অভিব্যক্ত, যা নিঃসন্দেহে অনুসরণীয়। তেমনি, খৃষ্টান পাদ্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত তাঁর আবেদনে তিনি বারংবার এই প্রার্থনাই

উচ্চারণ করেছেন, ঈশ্বর যেন মানুষকে সেই ধর্ম দান করেন যা অনৈক্যের নয় ঐক্যের সহায়ক।

একথা অবশ্যই সর্বদা স্মরণীয় যে, ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারতবর্ষে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল কৃত্রিম সমাজ-সম্পর্কের বাধ্যবাধকতায়। প্রাচ্যের একটি আত্মমগ্ন সমাজের অন্তর ভেদ করে তাঁরা উদ্ভিন্ন হয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য আগ্রাসী সভ্যতার তাড়নায়। সামাজিক ইতিহাসে তাঁরা অভিনব বলে স্বীকৃত ; আর এও স্বীকৃত যে, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্ত্য কোন সমাজেই তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত ছিল না। ফলে, তাঁদের চিন্তামননে আচরণে, মানসিক প্রক্রিয়া ও প্রত্যয়ে বৈপরীত্য, বুদ্ধিগত সঙ্করত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সম্পর্ক ও সামাজিক শিকড় তাঁরা ছিন্ন করতে চান নি নিশ্চয়ই, কিন্তু স্ব-সমাজের সঙ্গে অন্বিত থাকা তাঁদের অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি। পাশ্চাত্ত্যের ইন্দ্রিয়-সংবেদ্যতার উপস্থিত আকর্ষণে তাঁরা বিমোহিত হয়েছেন, সঞ্চালিত হয়েছেন এর জীবন-সাধনার ঐহিকতার সম্মোহে ; অথচ যে ঐতিহ্যে তাঁদের ছিল স্বাভাবিক উত্তরাধিকার, তার জীবনসাধনার মৌল প্রেরণা ছিল পারত্রিকতা, ঐহিকতা নয়। সেজন্য জীবনচর্যায় তো বটেই, আদর্শের অনুধ্যানেও ইওরোপীয় প্রেয়োবাদ এবং ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রশ্নটি তাঁদের মননে গুরুত্ব অর্জন করে। বলা যায়, তাৎক্ষণিক প্রায়োগিক ফললাভের প্রেক্ষিত থেকে বিভিন্ন সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণেব প্রবণতা তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন নি।

রামমোহনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। জন ডিগবির নিকট এক পত্রে তিনি লেখেন, "দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, হিন্দুগণ বর্তমানে যে ধর্মাচরণ অনুসরণ করে চলেছে তা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। বর্ণব্যবস্থা, যা তাদের মধ্যে অসংখ্য বিভাগ ও উপ-বিভাগ সৃষ্টি করেছে, তাদের রাজনৈতিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার পথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে ; এবং অগণিত যেসব ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান, সংস্কার ও আত্মশুদ্ধির নিয়মকানুন প্রচলিত আছে, তার ফলে কোন দুরূহ কর্মোদ্যোগ গ্রহণে তারা অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, অন্তত রাজনৈতিক সুবিধাদি লাভ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য তাদের ধর্মাচরণে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন আবশ্যক।" এই সুপারিশের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাজনৈতিক এবং বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের বাসনায় রামমোহন ধর্মীয়

অভ্যাসে বাঞ্ছিত রদবদলের কথা বলছেন। ইংরেজ-সাযুজ্য ও ঔপনিবেশিক শাসন-আশ্রিত ঐহিক ফলপ্রাপ্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় স্বভাবতই ধর্ম জিজ্ঞাসায় সত্য সন্ধানের প্রশ্নটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। অন্য কথায়, সেইরূপ ধর্মাচরণেরই তিনি সুপারিশ করছেন যা শাসনকর্তাদের অনুমোদন লাভ করবে, এবং যা জনসমষ্টিকে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অন্বিত রাখবে। এভাবেই ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবিগণ ক্ষমতাসীন শ্রেণীর স্বার্থ ও ভাবাদর্শ প্রচারকের ভূমিকা পালন করেন।

ধর্মমত বিষয়ক আলোচনা ও বিতর্কে তাঁর যে ভূমিকা তাতেও এই মনোভঙ্গি এবং ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টিমার্গ থেকে অনির্দিষ্টতার স্বাক্ষর স্পষ্ট। একথা অবশ্যই সংশয়াতীত যে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ও একেশ্বরবাদী প্রত্যয়ে তিনি সর্বদাই সুস্থিত ছিলেন, তথাপি ধর্মবিশ্বাসে তিনি এতটাই নমনীয় ছিলেন যে হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টীয় শাস্ত্রাদিতে তাঁর বিচরণ ছিল অনায়াস, এবং তিনি নির্দ্বিধায় যে কোন একটি ধর্মমতকে অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ীদের আক্রমণ থেকে সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারতেন। সেজন্য কেউ তাঁকে বলত মৌলবী, কেউ বলত পাদ্রী। অবশ্য তিনি এর কোনটাই ছিলেন না। বেদ-গ্রন্থাদির মুদ্রণ, প্রচার এবং বিশ্লেষণ যদিচ তাঁর মুখ্য কর্ম ছিল, তথাপি তিনি ১৮২০ সনে খৃষ্টীয় ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে "দ্য প্রিসেপ্‌টস্‌ অব জিসাস" রচনা ও প্রচার করেন, পরের বছর স্থাপন করেন ইউনিটারি চার্চ; আবার ঐ বছরের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রে (ইংরেজি দ্য ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন) তিনটি সংখ্যায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খৃষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য তিনি ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পাদ্রীদের ধর্মান্তরকরণের কাংক্রম তিনি পছন্দ করতেন না; কলকাতার তৎকালীন বিশপ ডঃ মিডলটন যখন তাঁকে খৃষ্টান হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি কিভাবে রেভারেণ্ড ডাফের স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আনুকূল্য করেছিলেন এবং বাইবেল থেকে পাঠগ্রহণে আপত্তিকর কিছু নেই বলে পরোক্ষে ডাফের ধর্মপ্রচারে সহায়ক হয়েছিলেন এবং স্বয়ং ইউনিটারি চার্চ স্থাপন করেছিলেন তা যুক্তিবিচারে সমর্থন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বেন্থামের দর্শনচিন্তার প্রভাব রামমোহনের ধর্মীয় আদর্শ ও অভ্যাসের রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। সেই ধারণার প্রেক্ষিত থেকেই কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁকে ধর্মবিশ্বাসে বেন্থামাইট বলে অভিহিত করেছিলেন।, এই অভিমতের তাৎপর্য দাঁড়ায়,

রামমোহন পরম সত্য অথবা মিথ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ধর্মমতগুলোর বিচার করতেন না। বিচার করতেন তাঁদের ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রেক্ষিত থেকে। অর্থাৎ, যে ধর্মাচরণের মাধ্যমে মানুষের পার্থিব দুঃখদুর্দশার লাঘব এবং সুখ সুনিশ্চিত হয়, তা-ই অনুসরণের যোগ্য।

তাঁর ধর্মানুভূতির অনিশ্চিতা সম্পর্কে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য উদ্ধার করা যাক। ১৮৩৪ সনে রামমোহনের আমেরিকা ভ্রমণের কথা ছিল, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর দরুন সেই কার্যক্রম অসমাপ্ত থেকে যায়। তথাপি, তাঁকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ খৃষ্টানদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত ছিল না। ইউনিটারিয়ান, ট্রিনিটারিয়ানরা সকলেই তাকে আপন আপন দলভুক্ত বলে দাবি তুলে পরস্পরের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করত। সেই বাদানুবাদ এমনই পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে ১৮৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে 'কোর্ট জার্নাল' নামক একটি পত্রিকায় জনৈক প্রতিবেদক মন্তব্য করেন, "It is ridiculous·········to witness the audacity with which the Unitarians and Trinitarians in England contend for the honour of this highly gifted man, having renounced the idolatry of his countrymen for their sect. The fact is, Rammohan Roy was a Lutheran with the churchmen, a Unitarian with Dr. Carpenter, a follower of Moses and the prophet with the Jews, a pure Hindoo, or rather a Buddhist with a few of his countrymen, and a good Mussalman with the disciples of Mohammet. ····· He had no faith in creeds, and having renounced the adoration of a million Deities in Hindooism, because contrary to reason, he was not likely to be a believer in Trinity, the doctrines of which are inscrutable to moral reason.". (Rammohan Roy and America— Adrienne Moore) অর্থাৎ, তাঁদেরই গোষ্ঠীগত বিশ্বাসে দীক্ষিত হওয়ার জন্য এই অতিশয় প্রতিভাধর ব্যক্তি নিজ দেশবাসীর পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছেন, এই সম্মান লাভের বাসনায় ইংল্যাণ্ডের ইউনিটারিয়ান ও ট্রিনিটারিয়ানগণ যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাদানুবাদে লিপ্ত, তা অত্যন্ত হাস্যকর। প্রকৃত সত্য হলো, মিশনারীদের নিকট রামমোহন হলেন একজন মার্টিন লুথার, ড. কার্পেণ্টারের নিকট তিনি ইউনিটারিয়ান, ইহুদিদের নিকট একজন মোজেস্ শিষ্য, কিছু সংখ্যক স্বদেশবাসীর নিকট তিনি বিশুদ্ধ হিন্দু

বরং বলা চলে বৌদ্ধ, আর মহম্মদের শিষ্যদের নিকট তিনি হলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলমান। ...... কোন প্রকার গোঁড়ামিতে তাঁর আস্থা ছিল না, যুক্তি বিরুদ্ধ বলে তিনি হিন্দুধর্মের অগণিত দেব দেবীতে বিশ্বাস বর্জন করেছেন; সেই মানুষ ট্রিনিটি-তত্ত্বে আস্থাশীল হবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়, ঐ তত্ত্ব মানবিক বুদ্ধির বিচারে একান্তই দুর্জ্ঞেয়।

অপরটি প্রচারিত হয়েছিল একটি কৌতুক নক্সা রূপে। ১৮৩০ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ ও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার রূপরেখা সম্পর্কে বিলাতের পার্লামেণ্টে আলোচনা চলছিল; তখন জনৈক কৌতুক-রসিক "ভারত শাসন পরিকল্পনা—একটি নাটক" শীর্ষক একটি রসরচনা প্রকাশ করেন। তাতে একটি চরিত্রের বাচনিক বলা হয়, রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল করা হোক, বিচারবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, এবং পুলিসবিভাগের পদগুলো যথাক্রমে মুসলমান, হিন্দু এবং বৃটন বা ইঙ্গভারতীয়দের দেওয়া হোক। এই সুপারিশের পরিশেষে বক্তা এই বলে আনন্দ প্রকাশ করছে, The beauty of this plan, ladies and gentlemen, consists in this: the Raja is neither a Hindoo, a Mahomedan, nor a Christian, so that he can have no bias towards any part of the population of India. অর্থাৎ, রাজা রামমোহন হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, খৃষ্টানও নন; সুতরাং ভারতের জনসমষ্টির কোন অংশের প্রতিই তাঁর পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর ধর্মমতের নমনীয়তা ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নিকট অতিশয় প্রকট ছিল। বস্তুত, তাঁর প্রকৃত ধর্মমত কি সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতার কোন সীমা ছিল না; একটি স্থির বিন্দুতে একে নির্দিষ্টতা দান করা প্রায় অসম্ভব। বোধকরি সে জন্যই কেশবচন্দ্র সেন একে একটি অমীমাংসিত রহস্য (standing mystery) বলে উল্লেখ করে গেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি এই সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি রামমোহনকে বৈদিক হিন্দু বলে বর্ণনা করেন, যিনি পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা থেকে হিন্দুদের মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন, তাঁকে পূর্ণ অর্থে বৈদিক হিন্দু বলেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, বেদগ্রন্থাদির উৎস সম্পর্কে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। এবং সেজন্যই তিনি প্রিসেপ্ট্স্ অব জিসাস রচনা করেছিলেন। এইরূপ বিশ্লেষণে সমস্যা অমীমাংসিতই থেকে যায়। [ভু ফাদরা

অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া, পৃ ১৮৫]

সে যাই হোক, বুদ্ধিজীবীরূপে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্কে তিনি কিভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন, তাই আমাদের আলোচ্য। স্মরণযোগ্য যে, বৈষয়িক স্বার্থে তিনি কলকাতায় বসবাসকারী ইওরোপীয়দের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা ছাড়া, ব্যবসায়-লব্ধ অর্থ জমিতে লগ্নী করায় ভূম্যধিকারী রূপে ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামোয় সুচিহ্নিত দায়দায়িত্বের বোধে তাঁর অবস্থান নির্দিষ্ট ছিল। আর একথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে তিনি এবং তাঁর কালের মানুষেরা ইংরেজ-শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে গণ্য করতেন। সুতরাং, তাঁর ঈপ্সিত যে রূপান্তর সে রূপান্তর গুণগত বিশ্লেষণে এমন বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত যে তা ঐ সম্পর্ককে কোনও ভাবে বিঘ্নিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। এবং নিতান্ত ঐহিক সুখসমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় তিনি যাদের সামাজিক ও ধর্মাচরণে পরিবর্তন সাধনের পরামর্শ দিয়েছেন, তারা সেই শ্রেণীভুক্ত মানুষ যারা ইংরেজ সংস্পর্শে অথবা ইংরেজ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা দ্বারা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়েছে। রামমোহনের বোধবুদ্ধি মনন কর্মের মাধ্যমে কালের যে আন্তর গরজ অভিব্যক্ত, তা নিঃসন্দেহে এই সমস্বার্থের বোধে ও স্বীকৃতিতে সীমিত। কিন্তু, ইতিহাসের গতিপ্রবাহের এই বৈশিষ্ট্য যে, কোন শ্রেণী যখন আপন আধিপত্যের দাবিতে সামাজিক আন্দোলনের শীর্ষে নিজেকে স্থাপন করে, তখন অন্যান্য শ্রেণীও পরোক্ষে ঐ আলোড়ন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এর শুভ অশুভ ফসলের অংশীদার হয়। সামাজিক আবর্তে রামমোহনের অবদানকে সেই দো-ফসলা জমিকর্ষণ রূপেই গ্রাহ্য করতে হবে, এবং তা-ই হবে মূল্যায়নের প্রেক্ষিত।

তাঁর এক প্রতিপক্ষ একদা তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন পৌত্তলিক হিন্দুর দিনরাত্রির শান্তি বিনষ্ট না করে আপন আত্মার সদ্‌গতির জন্য নিয়ত নিবিষ্ট থাকেন। এর উত্তরে রামমোহন জানান, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের এই পরামর্শের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করতে আমি অক্ষম বলে তিনি আশা করি আমাকে মার্জনা করবেন। নানান কারণে আমি তা গ্রাহ্য করতে পারছি না। প্রথমত, ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনায় আচ্ছন্ন নয় এমন মানুষের নিকট তার সহযাত্রীদের দীনতা ও দুঃখ দুর্দশার প্রতি সংবেদনশীলতা ঐচ্ছিক নয়, একান্তই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অধ্যাত্ম বিধান সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে, পৌত্তলিকতা দ্বারা—যা কখনও কখনও অতিশয় অশালীন ভাষা, কদর্য সঙ্গীত ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—জনসমষ্টি যে অপমান-

লাঞ্ছনা ও উপহাসের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করে রেখেছে, তাদের স্বদেশবাসী একজন হিসাবে আমি, সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ বর্ণের লোক হয়েও, তার অংশীদার। তৃতীয়ত, একজন মানুষের অপর একজন মানুষের প্রতি যে দায়িত্ববোধ তা-ই আমাকে তাদের হীনতা ও দাসত্ব থেকে উদ্ধার করা এবং তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার কর্মে প্রবৃত্ত করেছে।" এই প্রত্যুত্তরে তিনটি বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন: (১) স্বদেশের অধঃপতিত সমাজ-সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীলতা, (২) দেশবাসীর আত্মক্ষয়ী জীবন-বোধের সঙ্গে জন্মলব্ধ অচ্ছেদ্য সংযোগ এবং (৩) আন্তরিকতা ও বিবেক নির্দেশিত কর্তব্যবোধ। এই উক্তি একদিকে যেমন তাঁর পৌরুষের পরিচয় বহন করছে, অপর দিকে তেমনি সামাজিক আবর্তে তাঁর ভূমিকার স্বরূপও এতে উদ্ভাসিত।

পূর্বেই ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম ভুবন থেকে আগত ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য জীবনবোধে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় ছিল ঐ দৃষ্টিমার্গেরই প্রাধান্য। ইতিমধ্যে ছোট মাপের জমিদাররূপে ঈষৎ ভৌমিক কৌলিন্যও তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অবস্থানগত বিন্দুতে সুস্থিত থেকে তিনি অনায়াসেই পূর্বোক্ত সমস্যাদির প্রতি নিরাসক্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু থাকেন নি, তিনি বেছে নিলেন বিরোধ ও সংগ্রামের পথ। নিষ্প্রাণ সংস্কার ও অভ্যাস, নির্বাচিত কিছু অযৌক্তিক সামাজিক রীতি ও অবিচার, ধর্মীয় উপাসনায় অযৌক্তিকতা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। সেই সংগ্রামে ও সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন একাগ্র, অবিচল। অ্যাডাম তাঁর একাগ্রতার একটি চিত্তহারী বিবরণ দান করেছেন; তিনি লিখেছেন, "he seemed to feel, to think, to speak, to act, as if he could not but do all this, and that he must and could do it only in and from and through himself, and that the application of any external influence, distinct from his own strong will, would be the annihilation of his being and indentity" এই উক্তিটি মারটিন লুথারের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আরেকটি উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; সেটি হলো, By this I stand, I cannot do other-wise. বস্তুত, তাঁর অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রামমোহন ঐ যুগসন্ধিক্ষণে যেন এই আত্যন্তিক প্রেরণায় চঞ্চল যে, তিনি যা অনুভব করছেন, চিন্তা করছেন, বলছেন বা করছেন, একমাত্র তিনিই অন্য-নিরপেক্ষভাবে তার

অধিকারী, এবং এইরূপভাবে সঞ্চালিত হওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভে বুদ্ধিজীবীদের মানসবৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে রামমোহনের সত্ত বিশ্লেষিত মনোভঙ্গি ঐক্যসূত্রে বাঁধা। ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বীকৃতিতে তাঁর মধ্যেও একই ধরনের উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস। ঔপনিবেশিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই ধরনের আত্যন্তিকতা অনুভব করেছেন, কারণ তা ছিল ঐ মুহূর্তে সামাজিক গতিশীলতার অন্যতম প্রেরণা।

পৃথিবীর সব দেশের সব যুগের আত্মপ্রত্যয়শীল বুদ্ধিজীবীদের যেরূপ বেদনা-দায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, রামমোহনও তার নিপীড়ন অনুভব করেছেন অন্তরে—অর্থাৎ সাম্প্রতিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় অনন্বয়। পারিবারিক সামাজিক ও ধর্মবিশ্বাসগত অনন্বয় জনিত সমস্যায় তিনি বিব্রত হয়েছেন। কোন কোন পর্বে তার বন্ধুবান্ধবও তাঁর সান্নিধ্য বর্জন করা শ্রেয় বলে গণ্য করেছেন। তার জীবননাশের চেষ্টার কথাও সুপ্রচলিত। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "অবশেষে সকলেই আমাকে বর্জন করেছিল, শুধু দু-তিন জন স্কটিশ বান্ধব আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি, তাঁদের নিকট এবং তাঁদের জাতির নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।" অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আমার বিবেক ও আন্তরিকতা নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করে আমি, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, আমার আত্মীয়দের তিরস্কার ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছি, তাঁদের সামাজিক সংস্কার অত্যন্ত প্রবল, এবং বর্তমান সমাজ-কাঠামোতেই তাঁদের ঐহিক সুখসমৃদ্ধি সুরক্ষিত। কিন্তু, এসব পরিমাণে যতই প্রবল হোক না কেন, আমি প্রশান্ত চিত্তে সহ্য করতে পারি এই আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে যে একদিন আসবে যখন আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলো সুবিচারের দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে,—সম্ভবত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃতও হবে।" ঈষৎ বিষণ্ণ হলেও এই উক্তি আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত।

পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ভূমিকার বিচার করেছেন। যাঁরা তাঁর আন্দোলনের প্রবাহে স্নাত হয়েছেন, তাঁরা যে শ্রদ্ধা বিস্ময় অনুরাগের দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়েছেন, অন্যরা সেভাবে দৃষ্টিপাত করেন নি; তাঁর সমস্ত কর্মই যে জাতীয় বিবর্তন ধারার অনুমোদন অথবা ইতিহাসের মান্যতা লাভ করেছে তাও নয়। তবে, যে কথার কোন প্রতিবাদ চলে না, তা হলো বাস্তব মানবিক ভুবনের তাঁর যে বোধ এবং বুদ্ধিমার্গীয় আদর্শের যে অনুসন্ধান, তা প্রতি পদেই ঐতিহ্য-নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করছিল;

লঙ্ঘন করছিল তাঁর অবস্থানগত চৌহদ্দির নিয়ন্ত্রণও। তাঁর চিন্তার বিস্তৃতি বিলুপ্ত করছিল ভৌগোলিক ব্যবধান। বাংলায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর উপলব্ধিতে বাস্তবের বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য ও সত্যতা ধরা পড়েছিল, এবং এর অখণ্ডতার চেতনার উদ্‌বোধন ঘটেছিল। অবশ্য, বলা বাহুল্য, তার ব্যবহারিক আচরণ সর্বদা এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। তথাপি, ভাবাদর্শের যে অনুশীলন তাঁর মানসজীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়, তার ঈষৎ পরিচয় গ্রহণ করলেই পূর্বোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। একথা সবজনবিদিত যে তিনি ইওরোপ আমেরিকায় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যে কলকাতায় বিজয় উৎসব পালন করতেন, এবং সংগ্রামের ব্যর্থতায় মর্মাহত হতেন। ১৮২১ সনে নেপলসের নিয়মতান্ত্রিক সরকার অস্ট্রিয়ার আক্রমণে পরাভূত হলে তিনি সিল্ক বাকিংহামের সঙ্গে তার পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎকার বাতিল করেন এবং তার মনোবেদনার কথা প্রকাশ করে লেখেন যে, "নেপল্‌স্‌ এর অধিবাসীদের স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ অভিন্ন, তাদের শত্রু আমারও শত্রু।" অন্যদিকে, দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী স্পেনের শাসন ও অত্যাচার থেকে যখন মুক্তিলাভ করে, সেই বিজয়ে আনন্দিত হয়ে তিনি একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন। নিঃসন্দেহ যে, সেই সময়ে রামমোহনসহ ইংরেজ সাযুজ্যে লাভবান ব্যক্তিমাত্রই ইংল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ইংরেজ-নির্দেশিত সমৃদ্ধির আশায়। এও সত্য যে, স্বদেশের কৃষকদের অবস্থা ও জীবন সংগ্রামের প্রতি তারা বিশেষ কোন মনোযোগ দান করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবের ক্ষেত্রে মনোভঙ্গির প্রক্ষেপে রামমোহন সুদূর দিগন্ত স্পর্শ করেছিলেন, নতুবা পূর্ব-বর্ণিত দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করতে পারতেন না। ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে না হলেও আদর্শ চিন্তায় তিনি বিশ্বের সংগ্রামশীল জনসমষ্টির সঙ্গে আত্মিক ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। এর অতিশয় উজ্জ্বল স্বাক্ষর লাভ করা যায় ফ্রান্স ভ্রমণের ছাড়পত্রের জন্য তিনি যে আবেদন করেছিলেন তার একটি বাক্যে, বলেছিলেন, সমগ্র মানবগোষ্ঠী বিশাল একটি পরিবার, অগণিত জাতি এবং সম্প্রদায় ঐ পরিবারের অজস্র শাখাপ্রশাখা মাত্র। সেই বৃহৎ পরিবারের একজন সদস্যরূপেই তাঁর ফ্রান্স-ভ্রমণের অনুমতির প্রার্থনা। সমকালীন ইওরোপের উদারনৈতিক মনোভঙ্গির সঙ্গে তা একাত্ম।

বাংলায় এই কণ্ঠস্বর নতুন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক আবর্ত থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর, বাংলার রেনেসাঁসের সৃষ্টিশীলতার কণ্ঠস্বর। তেমনি, ১৮২৩

সনে সংবাদপত্রের উপর নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে রামমোহন তাঁর ফার্সি পত্রিক "মিরাৎ-উল-আখ্‌বার"-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন, এবং একটি ফার্সি বয়ান উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন, "হৃদয়ের অজস্র রক্তবিন্দুর বিনিময়ে যে মর্যাদা অর্জন করেছ, সামান্য খুদকুঁড়োর আশায় তুমি তা একজন মূটের দয়ার নিকট বিলিয়ে দিয়ো না।" বাকিংহাম অবশ্য তাঁর পত্রিকা 'দ্য ক্যালকাটা জার্নাল'-এ লিখেছিলেন যে রামমোহনের 'মিরাৎ' গুরুতর আর্থিক সংকটের মধ্যে দিনযাপন করছিল। এই সংবাদের সত্যতা মেনে নিলেও পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি যে মনোজ্ঞ সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তার বক্তব্য ও যুক্তি ম্লান হয় না। তৎকালীন সার্বিক ইংরেজ-আনুগত্যের চৌহদ্দির মধ্যে উচ্চারিত হলেও এই কণ্ঠস্বরও নতুন, নিঃসন্দেহে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর। কারণ, এই উক্তি ও কর্মের অর্থব্যঞ্জনা ও গতিকে আনুগত্যের নির্ধারিত সম্পর্কের মধ্যে সীমিত করে রাখা সম্ভবপর ছিল না, তা সামাজিক ভাবাবর্ত সৃষ্টি করতই এবং করেওছিল। কারণ, পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গি রামমোহনের এই কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিল।

মার্ক্স বলেছিলেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক-সামাজিক রূপান্তরে ইংল্যাণ্ড ছিল ইতিহাসের অসচেতন হাতিয়ার। সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক স্বার্থে শোষণ-নিপীড়নের জন্য আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ইংল্যাণ্ড শুধু যে ভারতবর্ষের এক প্রান্তকে অপরাপর প্রান্তের সঙ্গে সমস্বার্থের বন্ধনে সংযুক্ত করছিল তা নয়, পণ্য এবং লোক চলাচলের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিল এক অভূত-পূর্ব গতিপ্রাণতা ; এই জোয়ারে প্রাচীন বাধানিষেধের প্রাচীর ধ্বসে পড়েছিল। এই বাহ্য রূপান্তরের সঙ্গে মন চলাচলের সুসমঞ্জস পরিবেশ সৃষ্টি করা ছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোর সঙ্গে অন্বিত বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব। জ্ঞাতসারেই হোক অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক, রামমোহন সেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী চিন্তামননের প্রবর্তন, ভাবাদর্শে বিশ্বজনীনতার উদ্‌বোধন, অবক্ষয়ী সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে তিনি সমাজমানসে সেই গতির সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন যা পুরাতনের জীর্ণতাকে অস্বীকার করবে, এবং যুগোপযোগী অঙ্গাবরণ ধারণ করে নতুন পথে বাঁক নেবে। সংস্কৃতের বদলে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনার মধ্যেও তাঁর অন্তরে ছিল সেই গতি সৃষ্টির আশা যা বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে পৃথিবীর, আলোচ্য ক্ষেত্রে ইওরোপের, অন্যান্য জাতির সমপর্যায়ে স্বদেশকে

উন্নীত করবে। তাঁর চিন্তা ও কর্মের এই অন্তর্লীন গতিপ্রাণতার জন্য বলা যায়, তিনি ছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক সংঘাতকালীন মুহূর্তের 'এক অতি-সংবেদনশীল অভিব্যক্তি, এবং নির্দিষ্ট শ্রেণী-সম্পর্কে ধৃত বাহন।

পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুটি সংস্কৃতির সংঘাত ও আলোড়ন এই মানুষের আবির্ভাবের জন্য জমি কর্ষণ করেছিল ; এবং জমি ও বীজের যে চারিত্র বৈশিষ্ট্য তার লক্ষণ নবজাতকের দেহমনে অবশ্যই পরিস্ফুট থাকবে। রামমোহনেও আছে। সামাজিক পরিস্থিতির ধ্বংস ও সৃষ্টি এবং ঈপ্সিত সমন্বয় থেকে উদ্ভূত বৈপরীত্য, সমস্তই তাঁর প্রকাশের মধ্যে অভিব্যক্ত। তিনি তাঁর দেশ ও কালের, বিশেষত ব্যবসায়ী-জমিদার গোষ্ঠীর, উদ্বিগ্ন বিবেক, যে বিবেক জীবনের বহুবিধ সৃষ্টি-সম্ভাবনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, আপন সমাজে ভিন্নতর সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের আকুতিতে চঞ্চল। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনও কখনও এই প্রাতিভাসিক নজিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা সমকালীন মানুষের সঙ্গে পূর্ণ অর্থে অন্বিত নন অথবা সম্পূর্ণই অনন্বিত, তাঁরাই সমাজদেহে সঞ্চালিত করেন অভাবনীয় গতিময়তা। প্রতিরোধের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়েও সমাজ ধীরে ধীরে অন্য এক বন্দরের দিকে এগিয়ে যায়। রামমোহনও ঐসব ইতিহাস-পুরুষদেরই একজন। অবশ্য, তাঁদের চিন্তা-কর্মের এই ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা তাৎক্ষণিক প্রেরণা হিসাবে গোচরীভূত না-ও হতে পারে। রামমোহনের ক্ষেত্রে তা-ই সত্য। কারণ, ব্রাহ্ম আন্দোলনের সামাজিক সংঘাত এবং প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবদ্দশায় ততটা অনুভূত হয়নি যতটা ব্যাপক হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তাঁর বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর ব্রাহ্ম সমাজ কার্যত নিস্তেজ, অনাদৃত, উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃবর্গ সেই সমাজকে পুনঃসংগঠিত ও সজীব করে তোলেন, এবং তাঁদেরই নেতৃত্বে তা ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের বিস্তীর্ণ ভুবনে প্রসারিত হয়। রামমোহন স্থাপন করেছিলেন এর মৌল ভিত্তি, যার উপর ব্রাহ্ম আন্দোলনের সৌধটি নির্মিত হয়েছিল।

বুদ্ধিমার্গীয় প্রেক্ষিত থেকে বাংলার রেনেসাঁসের কোন সম্পদ তাঁর চিন্তায় অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, উপসংহারে তা পুনরায় স্মরণ করা যাক। পূর্ব-আলোচিত ভাবাদর্শগত সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত আচরণ, অনুভব ও বোধের ভুবন থেকে অসামঞ্জস্যের লক্ষণগুলোকে অবলুপ্ত করা। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই আদর্শ যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে

মানুষে মানুষে মিলন সহজ হয়। আর ব্যক্তি জীবনের সীমা থেকে মানবিক অভিজ্ঞতার সীমায় এই আদর্শকে প্রসারিত করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, এমন বোধের দীপ্তিতে রূপান্তরিত হওয়া যাতে জাতিগত ও রাষ্ট্রগত আচরণে সেই সত্যের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ হয় যাকে ইংরেজ পদার্থবিদ এল এল হোয়াইট একদা বলেছিলেন "decrease of assymetry" অথবা অসামঞ্জস্যের ন্যূনতা। ব্যক্তিগত ও জাতিগত পরিধিতে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যর ক্রম অবলুপ্তি একজন মানুষকে অপর একজন মানুষের সমপর্যায়-ভুক্ত করবে, এবং প্রশস্ত করবে মানবিক ঐক্যের পথ। সামাজিক উপাঙ্গে বিচরণশীল রামমোহনের চিন্তাকর্ম ঐ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত ছিল। যদিচ পাশ্চাত্যের "জলদস্যু" সভ্যতার প্রতি (শব্দটি অধ্যাপক টয়েনবীর, ইংরেজিতে পাইরেট) তিনি ছিলেন বিপুল মোহগ্রস্ত এবং ভাবতে সেই সভ্যতার প্রতিনিধি ইংরেজকে তিনি ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি ঔপনিবেশিক আশ্রয়ের মধ্যে স্থিত থেকেও মানবিক ঐক্য ও স্বাধীনতার বিমূর্ত তত্ত্বের স্বপক্ষে যে একটি সংহত কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল, তার তাৎপর্যও কম নয়। জাত বুদ্ধিজীবীর মত বিশ্বমানবিক প্রগতি, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের ভাবনায় তাঁর মন ছিল প্রসন্ন। সামগ্রিক উপলব্ধিতে তিনি ছিলেন সংস্কৃতি সংঘাতের ফসল, অবরুদ্ধ সমাজ থেকে সদ্য-নির্গত প্রাণশক্তির মত প্রতীক ঔপনিবেশিক কাঠামোর সতেজ সরব বুদ্ধিজীবী।

রামমোহনের রাজনীতি

যে কোন মানুষেরই রাজনৈতিক চরিত্র প্রধানত নিরূপিত হয় তার সামাজিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য দিয়ে ; অর্থাৎ, সমাজের কোন্ বিন্দুতে স্থিত থেকে এবং সামাজিক ধনোৎপাদনে কিভাবে অংশগ্রহণ করে সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত হয়, সমর্থন, উপেক্ষা অথবা বিরুদ্ধাচরণের গরজে, তার গুণগত বিচার দিয়ে। বৈষয়িক আর্থনীতিক স্বার্থচেতনা মুখ্যত এবং ক্ষেত্রবিশেষে আদর্শগত বিশ্বাস, ঐ সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ণয় করে। রামমোহন এই সাধারণ সূত্রের অন্তর্গত কর্মনিষ্ঠ পুরুষ , সুতরাং, তার সামাজিক অবস্থানের বিন্দুটিকে যথাযথ চিহ্নিত করা তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণের পূর্ব-সর্ত।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতা কলকাতা, বর্ধমান ও হুগলি জেলার বিপুল স্থাবর সম্পত্তি তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে বণ্টন করেন। সেই সুবাদে রামমোহন এক-তৃতীয়াংশ পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। ঐ সময় অথবা এর আগে থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। তাঁর ব্যবসায়ের মধ্যে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায়, বেনিয়ানগিরি, এবং মুখ্যত তেজারতি ; কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারিদের তিনি সুদে টাকা ধার দিতেন। ব্যবসায়িক সূত্রে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। প্রমাণস্বরূপ, ১৭৯৭ সনে দেখা যায় তিনি এণ্ড্রু রামজে নামক জনৈক সিবিলিয়ানকে সুদে সাড়ে সাত হাজার টাকা ঋণদান করছেন। দু বছর বাদে তিনি বর্ধমান জেলায় একই দিনে গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে দুটি বৃহৎ তালুক ক্রয় করেন। প্রামাণিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, তাঁর স্থাবর সম্পদের মধ্যে এ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান ; কারণ, এর জন্য প্রদেয় সদর খাজনা ২১,৮৬৮৭১৯ মিটিয়ে দিয়েও তাঁর পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বাৎসরিক আয় হতো। ১৮০২ সনে তাঁকে আরেকজন সিবিলিয়ান টমাস উডফোর্ডকে সুদে বড় রকমের ঋণ, পাঁচ হাজার টাকা, দিতে দেখা যায়। পরবর্তী সাত-আট বছরে তিনি আরও চারটি ছোট, ছোট তালুক ক্রয় করেন ; ১৮০৩-১৮০৪ সনে লাঙ্গুলপাড়া (এটি তাঁর লাঙ্গুল-

পাড়াস্থিত পৈত্রিক তালুক ভিন্ন অন্য একটি তালুক), ১৮০৮-১৮০৯ সনে বীরলুক, এবং ১৮০৯-১৮১০ সনে কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর। সব ক'টি তালুকই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ছিল। এগুলো থেকেও সদর খাজনা পরিশোধ করার পর তাঁর বাৎসরিক অতিরিক্ত পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আয় হতো। এভাবে জমিতে অর্থ লগ্নী করে একজন ছোট মাপের জমিদারে রূপান্তরিত হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন ও আর্থনীতিক কাঠামোয় তাঁর অবস্থান বিশেষ সম্পর্ক ও দায়দায়িত্ব দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যায়। এই সম্পর্ক শাসকদের পক্ষ থেকে নানান আইনগত প্রতিশ্রুতি ও জমিদারদের তরফে আনুগত্যের সর্ত দ্বারা স্বীকৃত।

এ ছাড়া তিনি এক বছর নয় মাস ভিন্ন ভিন্ন দফায় ও পদে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন ; আর দীর্ঘকাল ছিলেন জন ডিগবীর দেওয়ান। এ সব পদে অধিষ্ঠিত থাকার কালে, সে সময়কার বল্গাহীন স্বর্ণ মৃগয়ার দিনে, বেশ কিছু উপরি পাওনার ব্যবস্থাও সমগ্র আর্থনীতিক কাঠামোতে জড়িয়ে ছিল। অন্যান্যদের মত তিনিও যদি এর সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন তো বিস্ময়ের কারণ নেই। বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত অর্থ অতিশয় নির্ঝঞ্ঝাট লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করায় তাঁর কলকাতার ব্যবসায় জমজমাট আকার ধারণ করে ; এবং চাকুরি ও অন্যান্য বৈষয়িক কর্মে তাঁকে ১৮১৫ সনের পূর্বে অধিকাংশ সময় মফঃস্বলে কাটাতে হতো বলে তিনি গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিকে ব্যবসায়িক অবেক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। (এ সব সাক্ষ্য থেকে সামগ্রিক যে চিত্রটি স্পষ্ট হয় তা হলো, কলকাতায় বুদ্ধিমার্গীয় আলোড়নে জড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত, এবং সম্ভবত তার পরেও, তিনি ছিলেন বিত্তের সন্ধানে ধাবমান এক ব্যক্তি, যিনি অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।)

বর্তমান আলোচনার পক্ষে যা সবিশেষ প্রাসঙ্গিক তা হলো জমিদার রূপে তাঁর ও অন্যান্যদের বিবর্তনের নেপথ্য ইতিহাস। সরকারের প্রাপ্য ভূমিরাজস্বের পরিমাণ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন ; তাতে ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু, জমিদারকে দেয় কৃষকদের খাজনার পরিমাণ সেভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় জমিদারের তরফে কৃষককে অতিরিক্ত অন্যাধ্য খাজনার দাবিতে অত্যাচার ও শোষণ করার স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ থেকে যায়। পরবর্তী দেড়শ বছরের ভূমি-সম্পর্কের ইতিহাস কৃষকদের দৈহিক

নির্যাতন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং পরিণামে জমি থেকে উচ্ছেদের এক ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস। লর্ড হেস্টিংস ১৮৩১-১৮৩২ সনে এ প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে স্বীকার করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিম্ন আর্থনীতিক শ্রেণীর সমুদয় জনসমষ্টিকেই অত্যন্ত শোচনীয় অত্যাচারের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, এবং এ সম্পর্কে বৃটিশ সরকার এমনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তাদের দুঃখ লাঘবের সাধ্য কর্তৃপক্ষের নেই ["subjected almost the whole of the lower classes throughout these provinces to most grievous oppression ; an oppression too so guaran'eed by our pledge that we are unable to relieve the suffering."] বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন, কোন মতে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন, তাতে তিনিও এই অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন।

অপর পক্ষে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদর খাজনা মিটিয়ে দেবার যে সর্ত ঐ আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়, অনেক পূর্বতন ও নবীন জমিদারের পক্ষেই তা পালন করা সম্ভবপর হয় নি। ফলে, আইনপ্রদত্ত ক্ষমতায় সরকার তাদের জমিদারী নিলামে বিক্রয় করেন। (এককালের প্রভাবশালী অনেক পরিবার এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, অন্য দিকে বেনিয়ানগিরি, দেওয়ানগিরি এবং তেজারতি কারবারের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই যেসব মানুষ প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরা ঐসব লাটে-ওঠা জমিদারি ক্রয় করেন। এই নব-ধনিক সম্প্রদায় জমিদারিকে খুবই লাভজনক ব্যবসায় বলে গণ্য করতে আরম্ভ করেন। কারণ, সদর খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় পতিত জমিতে চাষাবাদের পত্তন করে এবং জোঁকের মত [রবীন্দ্রনাথ জমিদারকে জমির জোঁক বলে অভিহিত করেছিলেন] কৃষকের রক্ত শোষণ করে এর থেকে ঢের ঢের বেশি অর্থ সংগ্রহ করা তাঁদের নিকট বিশেষ কঠিন ছিল না। তাছাড়া, বিনা পরিশ্রমে এমন আয়াস, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নিজেকে ছোটখাটো একজন 'রাজা' বলে কল্পনা করার আনন্দানুভূতির সম্মোহও কম আকর্ষণীয় ছিল না। এভাবে যে নতুন জমিদারদের আবির্ভাব ঘটে বাংলার সমাজ জীবনে তাঁদের অধিকাংশেরই কৌলিন্যের বিলক্ষণ অভাব ছিল।) রামমোহন যে অল্প সময়ের মধ্যে দুটি মাঝারি ও চারটি ছোট তালুক ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাতে এই অনুমান

অসঙ্গত নয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত আর্থনীতিক পরিস্থিতির আনুকূল্য তিনি লাভ করেছিলেন। কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করার পর তিনি দুটি বাড়িও ক্রয় করেন; একটি চৌরঙ্গীতে, ২০,৩১৭ টাকায়, অপরটি মানিকতলায় ১৩,০০০ টাকায়।

এইসব জমিদারে রূপান্তরিত নব-ধনিকগোষ্ঠী যে তাঁদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন তাব উল্লেখ বাহুল্য। তাঁরা স্বয়ং তাঁদের বশংবদতার কথা ঘোষণা করতে আরম্ভ করার আগে থেকেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন। (পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে ইণ্ডিয়া হাউসের পদস্থ অফিসার টমাস পীকক বলেছিলেন, ভারতীব জনমতের শুধু একটি অংশই আমাদের সামরিক শক্তির অনুকূল; সেটা হলো জমিদারদের অভিমত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থাপনায় তাঁদেব স্বার্থ আমাদের স্বার্থেব সঙ্গে একাত্ম বলে স্বীকৃত। এ ছাড়া অন্য কোন জনমত আমাদের অনুকূলে সক্রিয় নয়।) [There is only one portion of public opinion in India that comes in aid of···our military power, and that is the opinion of the zamindars under the permanent settlement that their interests are identified with ours. Beyond this there is no public opinion that works in our favour.]

সেই নেপথ্য ইতিহাসেরই অপর দিক হলো ভারতের বাণিজ্যিক শোষণের অধিকার নিয়ে বৃটিশ পুঁজিপতিদের অন্তর্বিরোধ। সকলেই অবগত আছেন যে, ভারত-চীন বাণিজ্যের ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেকালে কতকগুলো বিশেষ একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছিল। ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠন করার ফলে ইংল্যাণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয় তাতে বৃটিশ পণ্যের বাজার যেমন বিশ্বময় বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে, তেমনি নানাবিধ বাণিজ্যিক গোষ্ঠীও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ভারত-চীনের বিভিন্ন বন্দর, বাজার এবং অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে এদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। এদের পক্ষ থেকে তাই অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ও দাবি উত্থাপিত হয়। পার্লামেণ্টেও এ নিয়ে আলোচনা চলে, বৃটিশ পুঁজি ও শিল্পোদ্যোগের নিকট ভারতের বন্দর ও বাজার উন্মুক্ত করলে যে সমৃদ্ধির সূত্রপাত হবে তার স্বপ্নময় চিত্র প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু, কোম্পানীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন ছিলেন না; তাই

একচেটিয়া অধিকার ও অবাধ বাণিজ্যের বিরোধ খুব সহজে মীমাংসিত হয়নি। কার্যত, ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত কুড়ি বছর ঐ বিরোধের কলরবে মুখর ছিল, এবং স্বাভাবিকভাবেই এর প্রবল তরঙ্গ কলকাতায়ও অনুভূত হয়। অবাধ বাণিজ্যের আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে এই দাবি উচ্চারিত হয়েছিল যে, ভাবতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের নির্বাধ স্বাধীনতা এবং ভারতে বৃটিশ পুঁজিপতি ও দক্ষ কারিগরদের নিয়ন্ত্রণহীন বসতি স্থাপন অতিশয় জরুরী। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই দাবির লক্ষ্য ছিল বৃটিশ পণ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে প্লাবিত করা এবং এককালের ক্ষুদ্র শিল্পসমৃদ্ধ ভারতকে বৃটিশ কলকারখানায় কাঁচামালের যোগানদার দেশ-এ পরিণত করা। (এই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হয়েছিল, অবাধ বাণিজ্যের নীতি গৃহীত হওয়ার পর ভারতের সম্পদশোষণ ও রক্তক্ষরণে কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না।)

(কলকাতার অবাধ বাণিজ্যের দাবিতে সোচ্চার ইউরোপীয়দের সঙ্গে রাম-মোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন এজেন্সি হাউস যারা নীলকর ও অন্যান্য সমগোত্রীয় বণিকদের অর্থ দাদন করত, তাদের ব্যবসায়ে তিনি অর্থ লগ্নী করতেন; এদের মধ্যে ম্যাকিণ্টশ্ কোম্পানী যে তাঁর বিষয় সম্পত্তি তদারক করার ভারপ্রাপ্ত এজেণ্ট ছিল তা তাঁর বিলেত অবস্থানকালীন কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের নিকট লিখিত একটি পত্র থেকে জানা যায়। কলকাতার অবাধ বাণিজ্যবাদী ইংরেজদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল বিস্তর, স্টক এক্সচেঞ্জেও তাঁর প্রভাব কম ছিল না, এবং তিনি তাঁদের সংগঠন কমার্শিয়্যাল অ্যাণ্ড পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য ও যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮২৮ সনের জানুয়ারী মাসে। এই সম্পর্ক থেকে তাঁর সামাজিক অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দুর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সহজ।)

এদিকে, পল্লী অঞ্চলে ইওরোপীয়দের জমিজমা ক্রয় করা সম্পর্কে যেসব নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, তা অল্পবিস্তর শিথিল করা হতে থাকে। ১৮২৪সনে কফি চাষ সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সর্তাধীনে ইওরোপীয়দের ভূমি ক্রয়ের অধিকার স্বীকার করা হয়। তারপর থেকেই কলকাতায় অবাধ বাণিজ্যবাদিগণ অবাধ বসবাসের দাবিতে আন্দোলন সংগঠন করতে থাকেন, এবং তাঁদের এদেশীয় সহযোগীদেরও আন্দোলনের আবর্তে সক্রিয় করে তোলেন। বেণ্টিঙ্কের আমলে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে এদেশে ইংরেজদের অবাধ বসবাসের নীতি সমর্থিত হতে থাকে। কারণ, বৃটিশ প্রশাসন এ সিদ্ধান্তে স্থিত ছিল যে, স্থায়ী,

ইওরোপীয় বাসিন্দা এবং তাঁদের দেশীয় সহযোগীবৃন্দই হবে ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর মৌল স্তম্ভ। এঁরাই যৌথ শক্তিতে ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও সম্ভাব্য আন্দোলনকে প্রতিহত করতে সমর্থ হবে। কলকাতার অবাধ বাণিজ্যবাদী ইওরোপীয়গণ ১৮২৯ সনের গোড়ার দিকে গ্রামাঞ্চলে জমিজমা ক্রয় করার অনুমতি প্রার্থনা করে সরকারের নিকট এক প্রতিবেদন পেশ করেন। এই আবেদন গ্রহণ করে এবং প্রচলিত আইনগত বাধাগুলো অপসারণ করার সুপারিশ করে বেণ্টিঙ্কের কাউন্সিল তা লণ্ডনে কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য কলকাতার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল তৎপর হয়ে উঠেন। ১৮২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে টাউন হলে অবাধ বাণিজ্যবাদী ইওরোপীয়গণ ও তাঁদের দেশীয় সহযোগীবৃন্দ, যথা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ, একটি সভায় মিলিত হন। সভায় কলোনাইজেশন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দ্বারকানাথ, সমর্থন করেন রামমোহন। প্রাসঙ্গিক বক্তৃতায় তাঁরা উভয়েই নীলকর সায়েবদের প্রশংসায় উদ্বেল হয়েছিলেন, বলেছিলেন যে ওদের দ্বারা চাষের এবং সামগ্রিকভাবে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। রামমোহন আরও বলেছিলেন, ইওরোপীয়দের অন্তরঙ্গ সাযুজ্যের ফলে দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নে যে বিপুল উন্নতি ঘটবে সে বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয়। তাঁর নিকট-অনুগামীদের একজন—কালীনাথ রায়—কলোনাইজেশনের দাবিতে পার্লামেণ্টে একটি স্মারকলিপি প্রেরণেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডে বসে ১৮৩২ সনে রামমোহন ভারতবর্ষে ইওরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তার পরিসমাপ্তিতে তিনি কোনপ্রকার বিধিনিষেধ প্রয়োগ না করে, সরকারের মর্জি-মাফিক নির্বাসনের আশঙ্কা বা আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণ না করে "বিত্তবান এবং চরিত্রবান" ইওরোপীয়দের ভারতে বসবাস করার অনুমতি ও উৎসাহদানের জন্য আবেদন জানান।

নীলকরদের দ্বারা চাষের উন্নতি এবং চাষাদের কল্যাণ সাধিত হয়েছে, রামমোহন-দ্বারকানাথদের এই অভিমত যে বাস্তব সত্য ও ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামবাংলার ইতিহাস ওদের অমানুষিক বর্বরতা দ্বারা কলুষিত। শুধু যে দেশীয় সংবাদপত্র ও

সাহিত্যে নির্যাতিত কৃষকদের আর্তনাদ প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা নয় ; সংবেদনশীল ইওরোপীয়গণও তাঁদের প্রতিবেদনে তা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ডাঃ বুকানন কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনে নীলকরদের নানাপ্রকার জালিয়াতি ও চাষীদের প্রতি ক্রীতদাসের মত ব্যবহারের উল্লেখ করেন। নীল-চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারকদের মন্তব্যেও এই অভিযোগ সমর্থিত হয়েছে। এমন নয় যে, রামমোহন বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না ; নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অথবা একে উপেক্ষা করে তিনি যখন অত্যাচারীকে সদাশয় বলে চিত্রিত করেন, তখন এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এই বিষয়টিকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করেছেন, নিগৃহীত চাষীর দৃষ্টিমার্গ থেকে নয়। করেছেন আরও এ কারণে যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য ঔপনিবেশিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল মানুষেরা—রামমোহন-দ্বারকানাথের মত ব্যক্তিগণ—টমাস পীককের ভাষায় তাঁদের নিজেদের স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ অভিন্ন বলে গণ্য করতেন।

একটি পরাধীন জাতির পক্ষে কলোনাইজেশনের নীতি যে কী মারাত্মক এক বিভীষিকা, রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই তা জানা। ঐ নীতির অনুসরণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মানুষেরা সমগ্র বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে যে ক্ষমাহীন অপরাধ সংঘটনে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তা উন্মোচিত করেছিলেন আবেগে ও বিক্ষোভে শাণিত ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। সেই অপরাধের প্রগলভ সাক্ষ্য বহন করছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রভৃতি দেশ ; সেখানকার আদি অধিবাসিগণ হয় নিশ্চিহ্ন নতুবা নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত, অথবা আত্ম-পরিচয়ে সম্পূর্ণ সর্বস্বান্ত। রামমোহন প্রার্থিত অবাধ কলোনাইজেশন যদি সত্য-সত্যই ভারতবর্ষে ঘটত, তাহলে বর্তমান কালে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বোধ করি আমাদের কারও অস্তিত্বই থাকত না। তিনি অবশ্য তাঁর নিজস্ব এবং শ্রেণীর উপস্থিত সমৃদ্ধি এবং পরোক্ষে সামাজিক প্রগতির সম্ভাবনার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন ; সুদূর ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এরূপ কল্পনাও করেছিলেন যে, স্বাধীন-চেতা ইওরোপীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত ও তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবর্ষ যদি কখনও ইংল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলেও বিচ্ছিন্ন দুটি স্বতন্ত্র দেশকে ঐক্যসূত্রে অন্বিত রাখা সম্ভবপর হবে, কারণ দুটি দেশ তখন ভাষাগত, ধর্মগত ও

সামাজিক আচার আচরণে একাত্ম হয়ে যাবে। [two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion, and manners.]

এই সব তদগত ভাবনার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ রামমোহনকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ দিয়ে থাকবেন ; কিন্তু ঈষৎ বিশ্লেষণ করলেই প্রতিভাত হবে যে, তাঁর কল্পনায় যে ভারতবর্ষ উদ্‌ভাসিত তা আত্মপরিচয়ে একেবারেই সর্বস্বান্ত। ধর্মে সে খৃষ্টান, তার ভাষা ইংরেজি এবং আদবকায়দায় সে ইংরেজ। একটি সুপ্রাচীন ঐশ্বর্যশীল সংস্কৃতিতে আশ্রিত যে ভারতবর্ষকে আমরা জানি এবং যার দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রাদির পুনরুদ্ধার ও প্রচারে তিনি স্বয়ং অতুলনীয় কর্মোদ্যমে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই ভারতবর্ষ তাঁর কল্পনায় অনুপস্থিত। তার আত্মপরিচয়, ইংরেজিতে যাকে বলে আইডেনটিটি, সম্পূর্ণ বিনষ্ট, সে গোত্রান্তরিত। এ জিনিস রামমোহনের কাম্য ছিল বলে বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু উপস্থিত গরজের প্রেরণায় তিনি যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, অনুসৃত হলে তার ফলশ্রুতি এ ছাড়া অন্য কিছু হতো না, হতে পারত না।

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো এবং ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্বার্থের বন্ধনে অন্বিত থাকায় রামমোহনের রাজনৈতিক মনোভঙ্গির গুণগত বৈশিষ্ট্য কি হতে পারত এবং কার্যত কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতি নিঃসর্ত সমর্থন। সরকারী বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রতিবেদনে, রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্যে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, তার পরিচয় গ্রহণ করলেই এই সত্য প্রমাণিত হবে। আত্মকথা বলতে গিয়ে একটি পত্রে তিনি বলেন, প্রথম যৌবনে বিদেশী শাসন সম্পর্কে তিনি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, পরে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে, অন্য কথায় তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে লিপ্ত হওয়ার পর থেকে, তিনি ভিন্নতর মত পোষণ করতে আরম্ভ করেন।

ভিন্নতর দৃষ্টিতে ইংরেজ জাতি ও ভারতে বৃটিশ শাসনের ভূমিকা কি রূপ পরিগ্রহ করে তার পরিচয় গ্রহণ করা যাক। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রচারিত তাঁর "খৃষ্টান জনসমষ্টির নিকট সর্বশেষ আবেদন"-এ তিনি অপ্রত্যাশিত-ভাবে ভারতবর্ষকে তার পূর্বতন শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে ইংরেজদের শাসনাধীনে ন্যস্ত করায় জগৎপিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে রামমোহন বলেন,

ইংরেজরা হলো এমন এক জাত যারা শুধু যে নিজেরাই নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে তা নয়, যেসব জাতির উপর তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় তাদের মধ্যেও স্বাধীনতা ও সামাজিক সুখসমৃদ্ধির বিধান প্রতিষ্ঠা করে, এবং সাহিত্য ও ধর্মীয় ব্যাপারেও মুক্তবুদ্ধির জিজ্ঞাসা অনুপ্রাণিত করে'। [a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves, in promoting liberty and social happiness, as well as free inquiry into literary and religious subjects, among those nations to which their influence extends.] সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত যে আবেদনে তিনি এবং তাঁর বন্ধুবর্গ ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট (দ্য কিং ইন কাউন্সিল) প্রেরণ করেন তাতে এই উদ্ধৃতিটি সংযুক্ত হয়, এবং প্রথম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আরও বলা হয় যে, আবেদনকারিগণ ইংরেজদের শুধুই বিজেতা রূপে গ্রহণ করেন না, গণ্য করেন পরিত্রাণকর্তা রূপে, এবং তাঁদের দৃষ্টিতে ইংল্যাণ্ডেশ্বর শুধুই শাসক-নৃপতি নন, তিনি তাঁদের অভিভাবক, রক্ষক।

উক্ত আবেদনেই ইংরেজদের ভারত-বিজয়ের তাৎপর্য তিনি ব্যাখ্যা করেন এ ভাবে: স্বেচ্ছাচারী মুসলমান বাদশাহদের রাজত্বকালে বাংলার অধিবাসিগণ, দৈহিক অপটুতা এবং বাহ্য কর্মকাণ্ডে অনীহা হেতু, শাসকদের প্রতি একান্তভাবে অনুগত ছিল, যদিচ তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, ধর্ম লাঞ্ছিত হয়েছে এবং যথেচ্ছভাবে তাদের হত্যাও করা হয়েছে। অশেষ করুণাময় জগৎপিতা অবশেষে ঐ স্বেচ্ছাচারীদের কবল থেকে বাঙালীদের উদ্ধার করে স্বীয় তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করার জন্য ইংরেজদের অনুপ্রাণিত করেন। [Divine Providences at last in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive the oppressed Natives of Bengal under its protection.] সেই বিধির বিধানে ইংরেজদের ভারতে আগমন; এবং ভারত-বিজয় সম্পূর্ণ হতে না হতেই তারা এদেশে এমন সব ব্যক্তিক স্বাধীনতাসূচক আইনকানুন প্রবর্তন করেছে যা অশ্রুতপূর্ব ও অভূতপূর্ব। ভারত-ইতিহাসে ইংরেজদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর এই বিশ্লেষণ পূর্বাপর অপরিবর্তনীয় ছিল।

এ থেকে ইংরেজ জাতি ও ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে যে মনোভঙ্গি ও রাজনৈতিক আচরণ প্রত্যাশিত, রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের আচরণ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ

সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তিনি ঔপনিবেশিক কাঠামোর সঙ্গে সর্বদা অন্বিত থাকতে চেয়েছেন। প্রেস আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে ছয় জনের স্বাক্ষর সম্বলিত যে আবেদন তিনি পেশ করেছিলেন, তাতে প্রারম্ভে বৃটিশ সরকারের প্রতি অপরিসীম আস্থা ও আনুগতা নিবেদন করা হয়; পরে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বলা হয়: সম্প্রতি বৃটিশ সরকার প্রতিবেশী শক্তির বিরুদ্ধে [মারাঠা রাজশক্তি এবং নেপালের বিরুদ্ধে অভিযান—লেখক] যে যুদ্ধ পরিচালনায় বাধ্য হয়েছিলেন তখন বহু সংখ্যক বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং স্বনামখ্যাত জমিদার স্ব স্ব উপাসনা স্থলে বৃটিশ শক্তির জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন; তাঁরা এই দৃঢ় প্রত্যয়ে আস্থাশীল ছিলেন যে ইংল্যাণ্ডের বিজয়লাভেই তাঁদের মানসিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং জীবন, ধর্ম ও ধনমান নিরাপদ। ঐ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা সংকটকালে তাঁদের সম্পত্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্পণ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের স্বার্থকে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ বলে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের অবিচল বিশ্বাস ছিল, ইংল্যাণ্ডের বিজয়লাভের উপরই তাঁদের সুখসমৃদ্ধি নিরাপত্তা নির্ভরশীল।

(এই মনোভঙ্গি রামমোহনের রাজনৈতিক ভাবনাকে আজীবন নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত রেখেছে;) এর ব্যত্যয় কখনও হয়েছে বলে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। প্রেস আইন প্রত্যাহার করার জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্ট এবং সপরিষদ ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিকট যে স্মারকপত্র পেশ করেছিলেন, তার লক্ষ্য যে কোন প্রকার অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। বৃটিশ সুশাসনকে আরও শক্তিশালী ও যুক্তিবহ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিষেধাজ্ঞামুক্ত সংবাদপত্র কি ভাবে সহায়ক হতে পারে তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং মাত্রাতিরিক্তভাবেই তা করা হয়েছে। বৃটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে তাঁদের অন্তরে কোনই সংশয়ের অস্তিত্ব ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে প্রেরিত স্মারকলিপিতে একটি বাক্যাংশ এইপ্রকার, "their interests will be as permanent as the British Power itself." আর, ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদনের ১৮ নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কার একথা ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কেউ এমন কিছু প্রকাশ করে যার মধ্যে সরকারের প্রতি ঘৃণা ও অবমাননা উদ্রেকের *প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, অথবা সরকারী বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্ররোচনা থাকে,*

করা যেতে পারে। [ইংরেজি বয়ান এই প্রকার, Whoever shall maliciously publish what has a tendency to bring the Government into hatred and contempt, or excite resistance to its orders, or weaken their authority, may be punished by Law as guilty of treason or sedition.] তারপর বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে অন্তর বাহির উভয় দিক থেকেই গভীর প্রশান্তি বিরাজিত এবং সরকারের মূলভিত্তিও পূর্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ। এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত সাধারণ আইন অনুসারেই পূর্বকথিত অপরাধের শাস্তিবিধান সম্ভবপর, নতুন এবং বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণের আশু কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

এই অনুচ্ছেদের বক্তব্য অত্যন্ত স্বচ্ছ। বিদ্রোহাত্মক অথবা শাসনব্যবস্থার সমালোচনা উচ্চারণ করার অভিপ্রায় আবেদনকারিদের ছিল না।* ঐ স্মারকপত্রের ৩১ নং অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়, স্বাধীন সংবাদপত্র পৃথিবীর কোন প্রান্তেই এ পর্যন্ত কোন বিপ্লব ঘটায় নি, কারণ, স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের আচরণ থেকে যেসব অভাব অভিযোগ উদ্‌ভূত হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে পারেন এবং তার প্রতিকারও হয়, ফলে, যে ধূমায়িত অসন্তোষ বিপ্লবের জনক তার অস্তিত্বই থাকে না। পক্ষান্তরে, যেসব দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না এবং সেজন্য গণ-অসন্তোষ অভিব্যক্ত ও দূরীভূত হয় নি, পৃথিবীর সর্বত্রই সেই সব দেশে ঐ কারণেই অসংখ্য বিপ্লব সংসাধিত হয়েছে। অথবা, সরকার যদি সামরিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা বিপ্লব দমনও করে থাকেন, জনগণ বিপ্লবের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থেকেছে। পরের অর্থাৎ ৩২ নং অনুচ্ছেদে আনুগত্য ও আশঙ্কাহীনতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এই ভাষায়—মাননীয় কোম্পানীর সেবকগণ স্বভাবতই বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্গে সুদৃঢভাবে সংযুক্ত, কারণ এই ব্যবস্থাই তাঁদের বিষয়-আসয় ও ক্ষমতার উৎস, এবং তাঁদের উচ্চতর সম্মান ও বৃহত্তর সমৃদ্ধির আশাও এই কাঠামোর উপরই নির্ভরশীল। আর, যদি একথা কল্পনাও করা যায় যে, তাঁদের মধ্যে আনুগত্য উজ্জীবিত রাখার পক্ষে এসব ভাবনা পর্যাপ্ত নয়, তাহলেও কর্তৃত্বচ্যুত হলে যে নিপীড়ন ও ধ্বংস তাঁদের অনিবার্য বিধিলিপি, সেই ভয়ই প্রার্থিত আনুগত্য উজ্জীবিত রাখবে। প্রেস আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এত যে আন্দোলন-নিবেদন তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যে শাসনব্যবস্থাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তার ভাবমূর্তি যেন জনমানসে বিনষ্ট

না নয়। আর, যদিও রামমোহন প্রেস আইনের আপাত প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর 'মিরাৎ-উল-আখ্‌বার' বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তথাপি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে তাঁর 'সম্বাদ-কৌমুদী'-র পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিলেন। ফলে, 'মিরাৎ' বন্ধ করার সময় তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কতটা আন্তরিক ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

ফরাসী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ভিকৃতব জাকমঁ কলকাতা আসেন ১৮২৯ সনের জুন মাসে। রামমোহনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মিলিত হন, এবং তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জাকমঁকে রামমোহন বলেন, "জাতীয় স্বাধীনতাকে পরম অর্থে কল্যাণকর বলে অভিহিত করা যায় না। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা করাই সমাজ বা রাষ্ট্রের লক্ষ্য অথবা অন্বিষ্ট। যখন কোন জাতি একক প্রচেষ্টায় ঐ লক্ষ্যে উপনীত হতে অসমর্থ হয়, যখন এর আন্তর প্রেরণায় ভবিষ্যৎ প্রগতির আকৃতি অনুপস্থিত থাকে, তখন এর থেকে অধিকতর সুসভ্য বিজেতা জাতির অভিজ্ঞতা দ্বারা, এমন কি তার কর্তৃত্বাধীনে থেকে, পরিচালিত হওয়াই বহু গুণে শ্রেয়।" রামমোহন পরনির্ভর-শীলতা এবং স্বাতন্ত্র্য এ দুটি শব্দের তাৎপর্য নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন, এবং তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত স্বরূপ ফরাসী বিজ্ঞানীকে জানান, "আমাদের অস্তিত্বের গরজেই যখন আমাদের প্রকৃতির সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত প্রাণীর উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, তখন জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি উদগ্র ভালবাসা কি একটা অলীক কল্পনা নয়? সমাজে নিজ নিজ অসম্পূর্ণতার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিবেশীদের নিকট হতে সহায়তা গ্রহণ করে, বিশেষ করে সেইসব প্রতিবেশী যদি অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়। তাই যদি সত্য হয়, তবে অন্য কোন জাতির উপর নির্ভরশীল না হওয়ার অবাস্তব দম্ভ একটি জাতির থাকবে কেন? বিজেতা জাতি যদি বিজিত জাতির তুলনায় অধিকতর সভ্য হয়, তাহলে তাদের বিজয়কে কদাচিৎ বলা যায় অশুভ; কারণ, তারা পরাভূত মানুষদের দান করে সভ্যতার সম্পদ। ভারত-বর্ষকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরায় অর্জন করার পথে যাতে অনেক কিছু খোয়াতে না হয়, সেজন্য তার সুদীর্ঘ কাল ইংরেজ-অধীনতা একান্ত প্রয়োজন।" এই যুক্তি ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নেই। এবংবিধ যুক্তি-পরম্পরা থেকেই তিনি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বশংবদতা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইতিপূর্বে যেসব প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, বলা বাহুল্য যে সেগুলির সঙ্গে

বর্তমান বিবৃতির বিন্দুমাত্রও অসঙ্গতি নেই।

(পরবর্তীকালে, ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে, তিনি ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। রাজস্ব নির্ধারণ নীতির অনিশ্চয়তা ও তজ্জনিত নানাপ্রকার অসুবিধার হাত থেকে জমিদারদের অব্যাহতি দেবার জন্য সরকার উদার মনোভঙ্গি গ্রহণ করে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু, জমিদারকে প্রদেয় প্রজাদের খাজনার ব্যাপারে ঐ একই মনোভঙ্গি কেন অনুসৃত হয়নি সেজন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত তিনি জমিদারদের সমালোচনা, সুতরাং ঈষৎ আত্মসমালোচনাও বটে, করে মন্তব্য করেন যে, ১৭৯৩ সনের এবং পরবর্তী কালের অন্যান্য আইনের বলে জমিদারদের হাতে যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তা যদৃচ্ছ প্রয়োগ করে তারা খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করেছেন; ফলে, লক্ষ লক্ষ প্রজাকে চরম দুঃখদুর্দশা ও বিপত্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারের যে তেমন কিছু সুবিধা হয়েছে তাও নয়। সেজন্য, তিনি প্রজাদের দেয় খাজনাও চিরস্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করেন)

এই সুপারিশ নিশ্চয়ই যুক্তিসম্মত এবং প্রশংসনীয়, কিন্তু, আমাদের বিচার্য ও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ঐ সুপারিশ উচ্চারণ করার সময় ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর ভবিষ্যৎ অর্থাৎ চির-স্থায়িত্বের প্রশ্নটিও রামমোহন-মানসে জাগ্রত ছিল। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করতে পেরেছেন, "বাংলা প্রেসিডেন্সির নিম্নভাগের প্রদেশগুলোতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পর থেকে জমিদারগণ বর্তমান সরকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে আছেন, এটা সুবিদিত। ··· সুতরাং, আমাদের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না যে যদি কৃষক, জোতদার এবং কৃষি শ্রমিকদের [রামমোহন the cultivators, the farmers and labourers শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন] ক্ষেত্রেও দেশের প্রতিটি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসারিত হয় তা হলে তারাও সমভাবে সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, এবং গণ-ফৌজ গঠন করেই হোক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই প্রয়োজন হোক না কেন, তারা সরকারের প্রতিরক্ষায় আত্ম-নিবেদন করতে প্রস্তুত থাকবে। সেক্ষেত্রে, বিদেশে এবং একটি সুদূর সাম্রাজ্যে বৃটিশ শাসনকে আপদমুক্ত রাখার জন্য—সে আপদ আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রই হোক বা বহিঃশত্রুর আক্রমণই হোক—এদের উপরই নির্ভর করা যাবে, বিরাট অর্থব্যয়

করে সর্বক্ষণ এক বিপুল সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখার আর প্রয়োজন থাকবে না।" আলোচ্য প্রতিবেদনে প্রজাদের দুরবস্থায় তাঁর সহানুভূতি সন্দেহাতীত, কিন্তু বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বের উদ্বেগও সমান গুরুত্বে উপস্থাপিত। শুধু তাই নয়, মনে হয় এই সমস্যাটিই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। আরও উল্লেখনীয় যে, প্রজাদের খাজনার হার স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণও আনুপাতিক হারে হ্রাস কবাব প্রস্তাবও ঐ প্রতিবেদনে করা হয়েছে। সুতরাং, প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ছিল কিনা, এ প্রশ্নটিও বিবেচ্য। তবে সবকারী রাজকোষের ঘাটতিপূরণ সম্পর্কে কিন্তু তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। জমিদারদের বাজস্বেব পরিমাণ হ্রাস করা হলে যে ঘাটতি দেখা দেবে তা পূবণের জন্য তিনি অত্যাবশ্যক সামগ্রী নয় এমন বিলাস-দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কব বসানোর সুপারিশ কবেছেন; এবং ইংরেজদের বদলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে দেশীয় কালেক্টব নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে প্রশাসনিক ব্যয়ভাব সঙ্কুচিত হয়। একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। শাসনকার্য পরিচালনাব জন্য কোন কোন পদে স্বল্প বেতনেব ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের যে সুপারিশ রামমোহন করেন, অনেকে একে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে উচ্চারিত প্রশাসনে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগের দাবির সঙ্গে গুণগত বিচারে একই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেন। কিন্তু, তা সঠিক নয়। কারণ, কংগ্রেস আমলে উচ্চারিত দাবি স্বাজাত্যবোধ থেকে উৎসারিত, যা ক্রমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার দাবিতে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু, রামমোহনের আমলে এই স্বাজাত্যবোধের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাঁর সুপারিশের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ, রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হলে শাসনকাযের ব্যয়ভারের মধ্যে সমতা আনয়ন। তাতে ঔপনিবেশিক কাঠামো আর্থিক দিক থেকে মজবুত থাকবে, কোনরূপ সংকটের মুখোমুখী হবে না। সার্বিক বিচারে সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে পার্লামেণ্টে রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা পযন্ত সর্বস্তরেই রামমোহন ব্যবহারিক রাজনৈতিক মনোভঙ্গি ও আচরণের প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে অন্বিত থেকেছেন এবং থাকতে চেয়েছেন। এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারেই তাঁর যাবতীয় আবেদন ও প্রস্তাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। স্মরণীয়, বৃটিশ শাসনের সঙ্গে অন্বিত এই মানুষটির জন্যই তাঁর লণ্ডন অবস্থানকালে নানাবিধ

সম্মাননা, প্রীতিভোজ, রাজ অভিষেকের উৎসবে বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে আসন দান, ইত্যাদি ব্যবস্থিত হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রামমোহন কি কখনও সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করেন নি? করেছেন; প্রেস আইনের প্রতিবাদে 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'-এব প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য প্রেরিত আবেদনগুলোতে আনুগত্যের যে চিত্র উন্মোচিত তাতে এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় তাঁর পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী' পুনঃপ্রকাশে সম্মতি দান কবায় প্রতিবাদী কার্যক্রম হিসাবে 'মীবাৎ'-এর প্রকাশ বন্ধ করার গুরুত্ব বিলক্ষণ খর্ব হয়। ১৮২৭ সনের জুরী আইন সংস্কারের জন্য নিষ্ফল আবেদন ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। আবার ১৮২৮ সনেব লাখেরাজ সংক্রান্ত এক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই প্রতিবাদ ছিল জমিদারদের শ্রেণীগত স্বার্থ সংবক্ষণের জন্য প্রতিবাদ, জনসমষ্টির কল্যাণের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য এ প্রতিবাদও ব্যর্থ হয়। বলা বাহুল্য, এইসব আবেদন ও প্রতিবাদ ঔপনিবেশিক কাঠামোব মধ্যেই এবং তাকে মান্যতা দান করেই উচ্চারিত হয়েছিল, সীমা অস্বীকার করার মনোভঙ্গি থেকে নয়। এবং লিখিত আবেদন ও প্রতিবাদ কোন ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেনি, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে অন্তরে অন্বিত মানুষদের নিকট আন্দোলন সংগঠনের কথা কল্পনারও অতীত।

তাহলে যে মৌল সমস্যা ও প্রতিভাসের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় তা হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যে বুদ্ধিজীবীরূপে তাঁর যে উল্লাস এবং পরাভবে যে মর্মপীড়া, বিপ্লবের পীঠস্থান ফ্রান্স সম্পর্কে তাঁর যে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি, তার সঙ্গে ইংরেজ-আনুগত্যের সামঞ্জস্য কোথায়? রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম লিখেছেন, মুক্তি-সচেতনতা তাঁর চিত্তে ছিল সর্বাধিক প্রবল, এত প্রবল যে তিনি মুক্ত বায়ুতেই শুধু নিশ্বাস গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। একদিকে মুক্তির এই আত্যন্তিক আকূতি, অন্যদিকে জাকর্মর নিকট জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহাকে অলীক কল্পনা বলা এবং দীর্ঘস্থায়ী বৃটিশ আনুগত্যের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রয়োগ—এই স্ববিরোধী মনোভঙ্গী ও বৈপরীত্যকে কি একই বিন্দুতে সংহত করা সম্ভব? তাঁর ক্ষেত্রে মুক্তি শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্যই বা কি? অ্যাডাম প্রদত্ত বিবরণ এ প্রসঙ্গে সহায়ক হতে পারে।

তিনি লিখেছেন, তাঁর মুক্তি-সচেতনতা শুধু দৈহিক নয়, মানসিক; শুধু কর্মের নয়, চিন্তার। তাঁর মানসিক স্বাধীনতা যদি কোনভাবে আক্রান্ত হতো, এমন কি নিছক আভাসে ইঙ্গিতে আক্রান্ত হলেও, তিনি গভীর ক্ষত ও অপমানের বোধ থেকে তা প্রতিরোধ করতেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এই বিবরণে মুক্তি শব্দটিকে ব্যক্তিগত চিন্তা-মনন-বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও উপলব্ধি করা হয়েছে; পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করার রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং জাতীয় ব্যাপ্তি একে দেওয়া হয়নি। রামমোহন এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, পূর্ব আলোচনায় এমন কোন প্রমাণও আমরা পাইনি।

অথচ, এই মানুষেরই কণ্ঠস্বর থেকে একদা এই ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছিল, স্বাধীনতার শত্রুরা এবং স্বৈরাচারের মিত্ররা পরিণামে কোনদিন জয়লাভ করেনি, এবং করবেও না কখনও। [১৮২১ সনে বাকিংহামকে লিখিত এক পত্রে এই মন্তব্য করা হয়।] এর দশ বছর বাদে ১৮৩১ সনে মিসেস উডফোর্ডকে লিখিত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, আজকের দিনের সংগ্রাম শুধু সংস্কারপন্থী ও সংস্কার-বিরোধীদের মধ্যে নয়, পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম চলছে স্বাধীনতা ও অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে। বিলেত থাকাকালে এরূপ মন্তব্যও করেছিলেন যে, রিফর্ম বিল যদি পার্লামেণ্ট গ্রহণ না করে তাহলে তিনি ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে চলে যাবেন। কিন্তু, আশ্চর্য এই, এইসব উদাত্ত উচ্চারণের কোনও প্রতিফলন অথবা স্বাকৃতি তাঁর ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ নয়। ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড বলতে অবশ্যই আমি ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামো সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণের কথাই বলতে চাইছি। এই স্ব-বিরোধের ব্যাখ্যাই বা কি? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বুদ্ধিজীবী হিসাবে ভাবাদর্শের অনুশীলনে তিনি যে সত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন, যে মানবিক শ্রেয়সের বোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, বিশুদ্ধ চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে এর মাহাত্ম্যকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি; আদর্শের আকর্ষণ সর্বদাই তাঁর চিন্তামননকে স্পর্শ করেছে। সেখানে স্বাধীনতার প্রত্যয়টি বিমূর্ত ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত। কিন্তু, পাশ্চাত্ত্যের যে প্রেয়োবাদী জীবনদর্শনে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যার প্রভাবে সত্যসন্ধানের মৌল প্রশ্নটিকে গৌণ করে শুধুই রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখসমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় তিনি স্বদেশবাসীর ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে পরিবর্তন সাধনের সুপারিশ করেছিলেন, সেই প্রভাব ও বৈষয়িক চেতনা তাঁর ব্যবহারিক জীবনকে একটি সুচিহ্নিত ধারায় প্রবাহিত রেখেছে। পূর্ব-

কথিত আদর্শের অনুপ্রবেশ বা বাস্তব রূপায়ণ এক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ছিল না। প্রাগ্রসর বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তাধারায় সমগ্র বিশ্বে তাঁর বিচরণ,(কিন্তু জমিদার ও ব্যবসায়ীরূপে ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়, অচ্ছেদ্য। স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীর ধিক্কার উচ্চারিত হলেও বৃটিশ শাসনের প্রতি জমিদার-ব্যবসায়ী রামমোহনের আনুগত্য নিঃসর্ত। তাঁর জীবনে বিত্ত ও মেধার যুগপৎ অস্তিত্ব এমনিভাবেই ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর অনুকূলে প্রযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ অবাধ বাণিজ্যবাদীদেব সঙ্গে যৌথ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ-কৃত তাঁর বিত্ত আর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এবং উদার স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ মেধা এর প্রসার ও প্রগতিশীলতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

উত্তরকালের দৃষ্টিতে রামমোহন

পূর্ব আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে, বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তার অনুধ্যানে রামমোহন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বসীমায় উপনীত হয়েছিলেন ; শাস্ত্রীয় বিচারে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং এই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ; নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার এবং মুখ্যত সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন ; ইংরেজদের ভারত অধিকার থেকে উদ্ভূত পরিবেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষায় আপন ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করেছিলেন ; স্থাপন করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ, যেখানে সমস্ত ধর্মের ও মতের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে ঐক্যের বন্ধনে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর মুহূর্তে তাঁর প্রভাব যে খুব একটা অনুভূত হয়েছিল, তা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। কারণ, ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (২য় খণ্ড) গ্রন্থে তাঁকে "একজন অসাধারণ মনুষ্য" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিক আলোচনা একেবারেই নিরুত্তাপ, এমন কি রামমোহনের সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

ব্রাহ্ম আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করার পর থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্য আলোকে উজ্জীবিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবদ্দশায় ব্রাহ্ম সমাজ ছিল শুধুই অঙ্কুর ; পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ঐ অঙ্কুর থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী সামাজিক গতিশীলতা ও রূপান্তরের প্রবাহ সৃষ্টিলাভ করে। সেই প্রবাহে স্নাত অগণিত মানুষ জাতীয় জীবনের প্রাঙ্গণে রেখে গেছেন অমলিন স্বাক্ষর। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যেমন দিয়েছেন নেতৃত্ব (সে নেতৃত্বের গুণগত চরিত্র যা-ই হোক না কেন), তেমনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, বুদ্ধিমার্গীয় জিজ্ঞাসায়। তাঁদের অনেকেই অবক্ষয়ী ঐতিহ্যের ধারক সমাজ বিধায়কদের কাছ থেকে ভোগ করেছেন লাঞ্ছনা, পরিবারবর্গ থেকে অনদৃত হয়েছেন, আপন বিবেক দ্বারা পরিচালিত

হওয়ার দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছেন। নিগৃহীত হওয়ার বেদনা ও ক্ষোভ এবং আদর্শের আকর্ষণ স্বভাবতই তাঁদের গোষ্ঠীবদ্ধতা ও সংগ্রামশীলতায় উদ্দীপ্ত করে, যার দুর্বার স্ফুরণ গোটা শতাব্দীকেই চঞ্চল করে রেখেছিল; এবং প্রথমে দ্বিধা ও পরে ত্রি-ধা বিভক্ত হলেও ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে স্থিত ব্যক্তিগণ ইতিহাসের অনুকূল অবদান ও সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আর, যেহেতু রামমোহন ঐ আন্দোলনের আদি বিন্দু, সেই হেতু সর্ববিধ প্রেরণা, উদ্দীপনা ও ব্যক্তিক আদর্শের ধ্যানে তাঁরা তাঁরই চিন্তা-মনন-কর্মের আশ্রয় সন্ধান করেছেন সর্বদা। সমকালের মানুষের নিকট যেমন, উত্তরকালের জন্যও তেমনি তাঁরা তাঁর জীবন ও ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করেছেন, ভূমিকার যথাযথতা সম্পর্কে যুক্তির সৌধ নির্মাণ করেছেন, অথবা হৃদয়াবেগে উদ্বেল হয়েছেন। তাঁদের আন্দোলন এবং সামাজিক প্রগতিশীলতা সেই কালে যেহেতু প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই হেতু প্রগতিবাদী চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট উত্তরকালের মানুষ তাঁদের দৃষ্টিতেই রামমোহনের দিকে তাকিয়েছে, তাঁদের প্রেক্ষিত থেকেই বিচার করেছে তাঁর কর্মের তাৎপর্য। এ বিষয়ে যাঁর অবদান সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমোহন সম্পর্কিত তাঁর বোধ ও উপলব্ধি সমকালীন সামাজিক ঘাত-সংঘাতের পটভূমিতে তাঁর কল্পনার অসামান্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধ ও ভাষণে। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির রসে লালিত মানুষ তাঁরই চোখের আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকাতে এবং তাঁর ব্যাখ্যাকেই নিপুণতম ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের রামমোহনকে সকলের আগে জানা প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন ইতিহাসের বাস্তব কী নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন সময়ের রচনায় রামমোহনের যে চিত্র উদ্‌ভাসিত, ধারাবাহিকভাবে তার একটি রূপরেখা নির্মাণ করা হবে প্রথমে। সবগুলো রচনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে করা হয়নি; তথাপি, নির্বাচিত রচনা থেকে গৃহীত উদ্‌ধৃতি যদি ঈষৎ দীর্ঘও হয় প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে তা অবশ্যই মার্জনীয়।

রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ রচিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে (প্রকাশ কাল, ৫ মাঘ, ১২৯১)। তখন তিনি তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক। ঐ বয়সে খুব পরিণত চিন্তার ফসল প্রত্যাশা করা সঙ্গত নয়,

তবে মৃত্যুর বাহান্ন বছর পরে রামমোহন ব্রাহ্ম চিন্তায় ও ঐতিহ্যে কি রূপ ধারণ করেছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তার উচ্ছ্বসিত প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "রামমোহন···· যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোনো কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্নি শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাহার কার্য হইতে বিরত করিতে পাবে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহাব কী অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কী সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কী না করিয়াছিলেন! শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গ-সমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তব পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজেব সর্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে-সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না! ·····

"কিন্তু বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন, সেই রামমোহন রায়· হিন্দুধর্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না,· রামমোহন সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পডিতেছিল, আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল—রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে 'এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।"

"ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম।···

ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে—যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন ; সমস্ত সংসার বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবনক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যান ধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী।"

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ও প্রত্যয়ের প্রচার তাঁর সম্পাদকীয় কর্মের অন্তর্গত ছিল নিশ্চয়ই, বিশেষত নব্য হিন্দু আন্দোলন তখন সংগঠিত হতে আরম্ভ করেছিল ; আর নববিধানের ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এ পটভূমিতে ব্রাহ্ম আন্দোলন সামগ্রিক অবদানকে সুসংহত রাখা ও শ্রেষ্ঠতার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতও ঐ সময়েই। জাতীয় পশ্চাদ্‌পটের প্রতিফলন ও সচেতনতা যে রবীন্দ্রমননে প্রত্যক্ষ এবং ভাষার উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত, তাঁর প্রতিটি রচনাতেই তাঁর সমকালীন ভাবনার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যাবে।

এর পরের উদ্‌ধৃতি ১৯০৮ সনের একটি রচনা থেকে, প্রকাশকাল শ্রাবণ, ১৩১৫। রামমোহন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।...তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর।...রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই।"

স্মরণীয় যে, এই বাক্যগুলো রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেন এমন এক মানস বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে যখন তিনি স্বয়ং স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বিযুক্ত হয়ে ইংরেজ-সাম্রাজ্য স্থিত হয়েছেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে স্থিত থেকে তিনি পাশ্চাত্য

সভ্যতার অমানবিকতা ও নৃশংসতার মুখোস উন্মোচিত করেছিলেন, ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে আঘাতে আঘাতে বিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু, আলোচ্য পর্বে, সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত থেকে তিনি ইওরোপকে বিশ্বমানবকে নিয়ে এক বিশাল পরীক্ষায় নিযুক্ত দেখতে পাচ্ছেন, এবং নিজেও ভারতবর্ষকে বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র রূপে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। সে দৃষ্টিতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ অবসারিত হয়েছে, তারা এখন ইউরোপীয় সাধনার দূত। সুতরাং, সেই কল্পনার মিলনক্ষেত্রে ইংরেজের উপস্থিতিও প্রয়োজনীয় ও কাম্য। এই মানসভঙ্গির প্রক্ষেপ সদ্য-উদ্‌ধৃত বাক্যসমষ্টির মধ্যে লক্ষণীয়। এই প্রক্ষেপ রামমোহনের চিন্তাকর্মের বাস্তব তথ্য দ্বারা সমর্থিত কিনা তা যথাস্থানে বিবেচিত হবে।

এর বছর তিনেক বাদে (পৌষ, ১৩১৮) তিনি লিখছেন, "রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মেব বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।"

১৩২২ সনে লিখছেন, রামমোহন রায় "এককে, সত্যকে লাভ করেছেন সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

"পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যাখ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।...

"এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন।...যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই।"

১৯২৮ সনে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, "রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল।' কর্তা

নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন—সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ।...

"তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন...মানবসত্যকে যিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন...যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতীর সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়নি।...

"রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে।"

রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কবি পর পর দুটি ভাষণ দান করেন। প্রথমটিতে বলেন (প্রকাশকাল, ১৪ পৌষ, ১৩৪০), "এই ভারত পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্রূপ অন্তরে দেখেছিলেন।...

"তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে মহৎ ঐক্যের আহ্বান।...

"তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য এক দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন, ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।...

"...আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এদেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়।"

তুদিন পরের, ১৬ পৌষের, ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের রামমোহন-পরিচিতি শেষ করছি: "দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সবে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন 'অপাবৃণু' হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী শুধু স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ।"

কবি একদা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁর জীবনে 'আদর্শ নায়ক' অথবা নায়িকা কে? উত্তরে লিখেছিলেন—রামমোহন রায়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে রামমোহন সম্পর্কে তাঁর যেসব অভিমত সঙ্কলিত হলো, তা ঐশ্বর্যশীল ভাষায় উচ্চারিত এক অপরূপ শ্রদ্ধার্ঘ। সন্দেহ নেই, এই শ্রদ্ধার্ঘ পারিবারিক ঐতিহ্য, তাঁর পিতার বাল্যস্মৃতি, ব্রাহ্মসমাজের সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক গরজ, ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে; এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব তৎসাময়িক মানসিকতা। পরবর্তী আলোচনায় তা ব্যাখ্যাত হবে। কোন মানুষেরই বিশ্বাসের জগৎ নিয়ে তর্কাতর্কি চলে না; তিনি তাঁর আদর্শ পুরুষকে কোন্ দৃষ্টিতে উপলব্ধি করবেন, তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলির ভাষা কিরূপ হবে, অথবা সেই পুরুষের মধ্যে কি কি গুণের প্রক্ষেপ অথবা প্রতিফলন ঘটলে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হবে, এসব বিষয় নিয়েও বাদানুবাদ অচল। কিন্তু, যেহেতু রামমোহন একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, যাঁর পদক্ষেপের সঙ্গে আধুনিক ভারতের অভ্যুদয় বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত, সেই হেতু তাঁর সম্পর্কে নিবেদিত অর্ঘ্য ব্যক্তিক বোধউপলব্ধির সীমা লঙ্ঘন করতে বাধ্য। তা সামাজিক জিজ্ঞাসার গুরুত্ব অর্জন করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা বিচার্য, জীবিতকালে দেশ-কাল-রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি যেরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং চিন্তামননকর্ম দ্বারা যে বিশেষ তাৎপর্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর উপর পরবর্তীকালে আরোপিত আদর্শ ও কর্ম সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ কিনা; দেখা প্রয়োজন, ইতিহাসের তৎকালীন আন্তর গরজকে তার প্রকাশের যথাযথতায় পরবর্তীকালে উপলব্ধি করা হয়েছে কিনা, অথবা শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পপল্লব থেকে বাস্তব সত্য উন্মীলিত হয়েছে কিনা। এ জিজ্ঞাসা আমাদের জাতীয় আত্মজিজ্ঞাসারই

অন্তর্গত। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং সেই বিবর্তনে যাঁরা নিশ্চিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁদের গুণগত ও সমষ্টিগত চরিত্র নির্মোহ দৃষ্টিতে আলোচনা করা অতিশয় জরুরী। ব্যক্তিক সম্মোহ থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার প্রয়োজনে যেমন, ঔপনিবেশিক শাসন কী এক অভিশপ্ত জীর্ণতায় আমাদের নিক্ষেপ করে রেখেছিল তা জানার প্রয়োজনেও বটে।

একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে তাঁর কালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে বিচার করেননি, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রেক্ষিত গ্রহণ করেন নি। এর মুখ্য কারণ, ভারত-ইতিহাসের বিবর্তনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন তাঁর উপস্থিত লক্ষ্য ছিল না, ঐতিহাসিক গবেষণাও না। সেইজন্য, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদিত রামমোহনের প্রতিবেদনগুলো তিনি কতখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন, অথবা রামমোহনের বিভিন্ন সুপারিশের রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য তিনি সঠিক গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কিনা, তা নির্ণয় করা দুরূহ। পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে হৃদয়ের যে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ, তাতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিষয়গত নির্লিপ্ততা অর্জন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই, রামমোহনের কর্মের এমন বিবরণ তিনি দান করেছেন, আদর্শের এমন বিশ্লেষণ উপহার দিয়েছেন যা তাঁর প্রতিবেদনের ভাষা থেকে সমর্থিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের রামমোহন সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার অবকাশ নেই বলে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘের মধ্যে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এমন তিন-চারটি বক্তব্য নিয়েই শুধু আমরা আলোচনা করব।

প্রথমত, ১৮৮৫ সনে রচিত প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল।" পরবর্তীকালের রচনাগুলোতে এই বক্তব্য নানাভাবে পল্লবিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯২৮ সনে তা এই ভাষা ও সিদ্ধান্তে অভিব্যক্ত হয়েছে, "যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় নি।" এই উক্তির মধ্যে যে শব্দ ও শব্দ-সমাহার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে তাহলো, স্বদেশপ্রেম, রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। প্রথমটি অর্থাৎ স্বদেশপ্রেম একটি বিমূর্ত নির্বস্তুক প্রত্যয় [আমি একে রাজনৈতিক তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছি, সামাজিক দিক থেকে নয়], প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে তা নির্দিষ্টরূপ গ্রহণ করে। রামমোহনের রাজনৈতিক স্বদেশপ্রেম কোন্ কোন্ কর্মের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্টতা অর্জন করেছিল, কবি সে সম্পর্কে কোন তথ্য পরিবেশণ করেন নি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান তিনি কোথায় কোন্ উপলক্ষে দাবি করেছিলেন, তারও কোন উল্লেখ নেই, এবং স্বজাতির সম্মান বলতে প্রকৃতই কি বোঝায় তারও কোন ব্যাখ্যা দান করেন নি। তবে, একথাটিকে পরবর্তীকালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করায় এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে তিনি আত্মশাসনের অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ; কারণ, যখন তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন, অর্থাৎ ১৯২৮ সনে, তখন জাতীয় আন্দোলনের প্রাঙ্গণে ঐ দাবি খুবই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তাহলে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের অর্থ দাঁড়ায়, আত্মশাসনের অধিকার অথবা স্বরাজের যে আকৃতি বর্তমান শতাব্দীতে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, রামমোহনের চিন্তাতেই তার অঙ্কুর নিহিত ছিল।

কিন্তু, সত্য এই, রামমোহনের বিভিন্ন রচনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি, বৃটিশ শাসনকে অন্যান্য অনেকের মত রামমোহনও বিধাতার আশীর্বাদ বলে গণ্য করেছেন, এবং এর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল নিঃসর্ত ; তাঁর ধারণায় ইংরেজরা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ভারতীয়দের চেয়ে উন্নততর বলেই তাদের শাসনকে অযৌক্তিক অথবা অকল্যাণকর অভিধায় ভূষিত করা যায় না। এক কথায়, ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা বা এর সমালোচনা তিনি কখনও উচ্চারণ করেননি ; বরং ধনিক শ্রেণীর ও তথাকথিত উন্নতচরিত্রের ইংরেজরা অধিক সংখ্যায় এদেশে বসবাস করুক অর্থাৎ কলোনাইজেশনের স্বপক্ষে তিনি জোরালো সওয়াল করেছিলেন। যখন প্রেস আইনের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন জানান, তখনও যে কোনপ্রকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা দাবি করেন নি ; স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যদি কেউ এমন কোন অভিমত ব্যক্ত বা প্রকাশ করে যাতে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা শিথিল হবার আশঙ্কা, তবে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তার শাস্তিলাভ বিধেয়। এসব বিষয় দ্বিতীয় বক্তৃতায় আলোচিত হয়েছে। শুধু একটিমাত্র প্রতিবেদনে কিছু কাঠোর শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৮২৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের প্রতিবাদে। ঐ আইনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, কোন লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর সম্পত্তি যদি বিধিবদ্ধ বলে বিবেচিত না হয় এবং এর ফলে কোন কালেক্টর তা অধিগ্রহণ করেন, তাহলে ঐরূপ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে বিচার প্রার্থনা করা যাবে না। এই আইনের বিরুদ্ধে বাংলা বিহার উড়িষ্যার জমিদারগণ সমবেতভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অ্যাডামের সাক্ষ্য অনুযায়ী ঐ প্রতিবাদ পত্রটি রামমোহন রচনা করেছিলেন।

তাতে তিনি এই ব্যবস্থাকে কঠোরতায় অভূতপূর্ব এবং অত্যাচারে তুলনারহিত [Unprecedented in severity and unparallelled in oppression] বলে অভিহিত করেন ; বলেন, সর্বাধিক স্বৈরাচারী সরকারও এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করবেন [the most despotic Government might feel reluctant to adopt]। স্মরণযোগ্য যে, আলোচ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জমিদারদের শ্রেণীগত স্বার্থ জড়িত ছিল, বৃহত্তর জনসাধারণের বৈষয়িক কোন স্বার্থ বা কল্যাণের প্রশ্ন এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এর আগেও অবশ্য রামমোহন জুরি ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে, যার ফলে হিন্দু ও মুসলমানগণ গ্র্যাণ্ড জুরির সদস্য হতে পারত না, এবং স্বদেশী-বিদেশী খৃস্টানদের বিচারও করতে পারত না, অযৌক্তিক ও উৎপীড়ক বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু, কোন বিশেষ বিধিব্যবস্থার সমালোচনা যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবির সমার্থক নয়, তার উল্লেখ বাহুল্য। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান —এই উক্তির যে বিপুল ব্যাপ্তি, যার গূঢ় অর্থ আত্মশাসনের অধিকার বা স্বরাজ লাভ, তার কোন উপস্থিত বা দূরবগাহী ইঙ্গিত রামমোহনের কোন রচনায়ই পাওয়া যায় না। তাছাড়া, ঐসব অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ কোন প্রত্যক্ষ কর্মের রূপ গ্রহণ করে নি। প্রসঙ্গত অন্যদের সম্পর্কে উচ্চারিত কবির একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের ইংরেজিবাগীশদের দেশসেবার আদর্শের কঠোর সমালোচনা করে তিনি লিখে-ছিলেন, তাঁদের চেতনায় দেশের অভিমান ছিল, দেশ ছিল না। ঐকালে দেশসেবার আকৃতি যদি ঐরূপ হয়ে থাকে তা হলে শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যখন জাতীয়তাবাদের উন্মেষই হয়নি, তখন তার চেহারা কি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য ব্যক্তি যদি রামমোহনও হয়ে থাকেন তাহলেও তার গুণগত চরিত্র বদলায় না।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তায়ই স্ববিরোধ বিদ্যমান। রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত রামমোহন থেকে—এ কথা তিনি যেমন বলেছেন তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ কথাও রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর মৃত্যু-শতবার্ষিকীর প্রথম ভাষণে কবি বলেছেন, "এই ভারত-পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়,·· রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়।" রামমোহনের সাধনার তাৎপর্য যদি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধন না হয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান বা স্বাধিকারের

কথা তো তিনি বলতেই পারেন না, কারণ মনুষ্যত্বের মিলন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-নিরপেক্ষ। আসলে, এই প্রত্যয়টি রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব অতি প্রিয় ভাবনা। তিনি নিজেও অনেকবার বলেছেন, দেশে ইংরেজ যে আছে সেটা বাইরের বস্তু, সুতরাং মায়া, স্বরাজ হলো অন্তরের সামগ্রী। এই তত্ত্বটিই তিনি রামমোহনের ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের প্রশ্ন। ১৯০৮ সনে রচিত একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মেলানোর জন্য, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষকে মেলানোর জন্য রামমোহন একাকী সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯০৮ সনের এই উপলব্ধি ১৯২৮ সনে এভাবে রূপান্তরিত হয়: "তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।" সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে একটি জাতি হিসেবে অনুভব করার চেতনা রামমোহন-মানসে অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, এবং মানবিক ভুবনকে একটি অখণ্ড সত্তা রূপে বিবেচনা করার বুদ্ধিমার্গীয় স্বীকৃতিও তাঁর বিভিন্ন সময়ের উক্তিতে উপস্থিত; কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন বলতে যে দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মিলন এবং মিলন থেকে নতুন সংশ্লেষে উপনীত হওয়ার সংকেত বোঝায়, রামমোহনের রচনায় বা অনুভবে তা অনুপস্থিত। ভারতের বাণীকে বহন করে তিনি বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এ সিদ্ধান্ত কতটা সমীচীন তাও বিচার্য। ধর্মগত প্রেক্ষিত থেকে এ প্রসঙ্গটি বিচার করলে দেখা যায়, রামমোহন শাস্ত্রীয় বিচারে পুরাতন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত একেশ্বরবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; আর, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে এ কথা স্বীকারেও কুণ্ঠা নেই যে তিনি "হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা" করেছিলেন। এও সত্য যে, হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদ্রীদের অভিযান তিনি সার্থকভাবে প্রতিহত করেছিলেন; কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধর্মমত সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ব বিশারদদের মধ্যে সংশয় প্রচুর। কেশবচন্দ্র সেন বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরাও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারেন নি। রামমোহন যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন সেখানকার ইউনিটারিয়ান, ট্রিনিটারিয়ান, প্রভৃতি ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রত্যেকেই তাঁকে নিজেদের ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করে রেষারেষিতে মত্ত হয়েছিল। ঐ সব গোষ্ঠী নিশ্চয়ই তাঁর চিন্তায় ও আচরণে তাঁদেরই চিন্তার সাযুজ্য ও প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছে। এই বাস্তব পরিস্থিতির কথা স্মরণে রাখলে এই সিদ্ধান্তে কি অবিচল থাকা যায় যে তিনি ভারতের বাণী বহন করে বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে

ছিলেন? বরং এই বিপরীত সিদ্ধান্তই তো অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, তাঁর ধর্মানুশীলনে খৃষ্টীয় আদর্শের অনুসরণ প্রত্যক্ষ করেই তাঁরা তাঁর প্রতি এমন ঐকান্তিক আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গটিকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে পূর্ব-পশ্চিম সাংস্কৃতিক সংঘাতের সমস্যা রবীন্দ্রনাথের কালে যে তীব্রতা অর্জন করেছিল রামমোহনের কালে ইংরেজ-সাযুজ্যে লালিত ব্যক্তিদের নিকট তার অস্তিত্বই ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপকতর হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ছিন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দেয়; তাকে সমন্বিত রাখা যায় কিনা, ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামোয় আশ্রিত জমিদার রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে ভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার মৌল সোপান ছিল দুটি দেশের স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি বা স্বাতন্ত্র্যের বোধ রামমোহনের ছিল না। তাঁর কালে "দস্যু" পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি ছিল শুধুই মোহ ও অনুরাগ, সেই ভুবনের প্রেয়োবাদী জীবনদর্শনকে উন্নততর মহত্তর বলে মান্যতা দান করার সাধারণ প্রবণতাও ছিল প্রবল। এত প্রবল যে, নব-ধনিক ও জমিদার পরিবারের পশ্চিমী ভাবাপন্ন সন্তানদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য পরিহার করাতেও কোনই আপত্তি ছিল না। মানসিক দিক থেকে রামমোহনও সেই মেরুতে উপনীত হয়েছিলেন। তাই, ১৮৩২ সনে ইংল্যাণ্ডে বসে তাঁর পক্ষে একথা ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল যে, ভারতে ইংরেজদের অবাধ বসবাসের ফলে যদি সেখানে স্বাধীনচিত্ততার বাতাবরণ সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষ দূর ভবিষ্যতে আমেরিকার মত স্বাধীনও হয়ে যায়, তাহলেও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সে অন্বিত থাকবে। কারণ, ততদিনে ভারত ধর্মাচরণে, ভাষায় ও আদবকায়দায় ইংল্যাণ্ডের মতই খৃস্টান ও ইংরেজিভাষী হয়ে যাবে। অন্য কথায়, নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, আত্ম-পরিচয় খুইয়ে সে হবে নিঃস্ব। অনাগত ভারতের এই যে চিত্র রামমোহনের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে এ প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা যায়, এতে ভারতবর্ষের বাণীর অস্তিত্ব কোথায়, কোথায় তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের চিহ্ন?

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে রামমোহন ভারতের নতুন যুগের স্রষ্টা, "যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই।" সমস্ত কর্মে

সমস্ত কর্মোদ্যমে তাঁরই হস্তাক্ষর প্রস্ফুটিত হচ্ছে। ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর থেকে যে ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির উদ্ভব, তার বিবর্তনে রামমোহনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অগ্রচারীর; বাংলার বুদ্ধিমার্গীয় বিকাশ, যুক্তিবাদী চিন্তামনন ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের বিস্তারে তাঁর অবদান পথিকৃতের। কিন্তু কোন যুগ বা সাধারণভাবে ইতিহাস কোন একজন মানুষের চিন্তা ও কর্ম দ্বারা নির্মিত হয় না, কোন কালেই হয় নি। নব-জাগরণের যে বৈশিষ্ট্য, সমস্ত দিক থেকে জেগে-ওঠার যে আহ্বান, সেই আয়ত্ত সর্বতঃস্বাহা বলে আহ্বান জানানোর ক্ষমতা কোন একজন মানুষের থাকে না, তিনি যত বড়ো প্রতিভাধর ব্যক্তিই হোন না কেন। একটি কালের আত্মপ্রকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে বহু মানুষের চিন্তা, কর্ম, আচরণ ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তার আন্তর সম্পদ তিল তিল করে সৃষ্ট হতে থাকে; যুগ থেকে যুগান্তরে যাওয়ার এই স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়ে যদি একজনের ব্যক্তিত্বকেই এর স্রষ্টা বলে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তাতে সেই তরঙ্গে স্নাত অন্যান্যদের সৃষ্টিশীলতা ও অবদান খর্ব হয়। সম্ভবত, অসতর্কভাবে তাঁদের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করাও হয়। অথচ, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন চরিত্রে এমন অন্তর্দৃষ্টি ও সচেতনতা আরোপ করেছেন সমকালীন ভারতবর্ষীয়রাই শুধু নয়, পাশ্চাত্ত্য-ভুবনের চিন্তানায়কগণও তার অধিকারী ছিলেন না। বলেছেন, "তখন এযুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এই অতিকথন যে ইতিহাসের সত্য নয়, তা বলা বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীকে একদা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিলেন মানুষকে একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আহ্বান জানানো এবং সার্বিক জাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ না- করতে পারার ব্যর্থতার জন্য। ['সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] সেই প্রেক্ষিত অবলম্বন করে রামমোহনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেই একই অসম্পূর্ণতা, একই সীমাবদ্ধতা। সেই সার্বিক জাগরণের আহ্বান যেমন অনুপস্থিত, তেমনি অনুপস্থিত জাগরণের পরিবেশ। তখন লোক চলাচল অথবা মন চলাচলের জমি কর্ষিত হয়নি, কর্ষিত হয়নি চেতনার জগৎ। তাছাড়া গান্ধিজীর তবু বিপুল গণ-সংযোগ ছিল, আর রামমোহন ছিলেন জনসমষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ অনন্বিত এবং অপরিচিতও। তাঁর বিচরণের পরিধি দ্রুত রূপান্তরশীল কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমিত ছিল, আর সীমিত ছিল সেইসব মানুষের মধ্যে যারা 'দুটি পরস্পর বিরোধী সংস্কৃতির সংঘাতের

তরঙ্গে অবগাহন করে, ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে অথবা ইংরেজ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার আশীর্বাদে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে তিনি প্রজাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট না-করে দেওয়ার জন্য ক্ষোভ এবং তাদের দুঃখ দুর্দশায় বেদনা প্রকাশ করেছেন সত্য, জমিদারদের সমালোচনাও করেছেন, কিন্তু জমিদার হিসাবে তাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ তাঁর ছিলই না। সুতরাং, জনসমষ্টিকে নেতৃত্ব দান করে ইতিহাসকে নির্দিষ্ট বাঁকের দিকে পরিচালনা করার আগ্রহ অথবা অবকাশ এর একটিরও অস্তিত্ব সেদিন ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর বোধ ও উপলব্ধি তাঁর ব্যক্তিক ও শ্রেণীগত স্বার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল; যদিচ বুদ্ধিজীবীরূপে চিন্তার জগতে বুদ্ধমার্গীয় গতিপ্রাণতা তিনি নিশ্চয়ই সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গান্ধিজী একটি আলোচনায় রামমোহকে 'বামন' [তিনি ইংরেজিতে 'পিগমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ-এর অনুবাদে বামন শব্দটি ব্যবহার করেছেন] বলায় রবীন্দ্রনাথ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'পিগমি' শব্দটির ব্যবহার নিঃসন্দেহে অশোভন এবং আপত্তিকর; তবে, কোন্ প্রসঙ্গে ও কাদের সঙ্গে তুলনায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। গান্ধিজীর বয়ানটি ছিল এইপ্রকার: Rammohun and Tilak were so many pigmies who had no hold upon the people compared with Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak. পিগমি বা বামন শব্দটির ভাবানুষঙ্গগত আপত্তি বাদ দিলে গান্ধিজীর মন্তব্য যে বিশেষ অযৌক্তিক তা বলা যায় না। গণ-সাযুজ্যের প্রেক্ষিতে তাঁর উক্তি যথার্থ।

চতুর্থত, প্রতিমা নির্মাণ, অথবা ইংরেজিতে যাকে বলে ইমেজ বিলডিং, কর্মে নিবেদিতপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি উক্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। তিনি বলেছেন, রুদ্রই তাঁকে একদিন কঠিনের পথে আহ্বান করেছিলেন; "সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস।" "পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যাখ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।" এই বিবরণে এমন এক ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রস্ফুটিত যিনি বৈষয়িক সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ নন, যিনি সত্যের অন্বেষণে আত্মসমর্পিত এক পথিক, রুদ্রের আহ্বানে সহজ আরামের পথ বর্জন করে কঠিন পথের যাত্রী এক ঋষি। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে

বলতে হচ্ছে, এই বিবরণের মধ্যে ইতিহাসের পুরুষ রামমোহন অনুপস্থিত। তাঁর জীবনের বাস্তব সাক্ষ্য থেকে আমরা জেনেছি, ঐ আমলের ইংরেজ-সাহচর্যে বিত্তবান অন্যান্য বহু মানুষের মত তিনিও বৈষয়িক লাভলোকসানের ব্যাপারে ঐকান্তিক ভাবেই লিপ্ত ছিলেন, এবং সেই পথেই বিস্তর ভূসম্পত্তি ও অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। ঐ অর্থ তাঁর যাটের অধিক পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র পরিচালনা, ইত্যাদি কর্মে ব্যয়িত হয়েছে। ইওরোপীয় অবাধ বাণিজ্যবাদীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, যার ফলে তিনি তাঁদের সংস্থার যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদেই নীলকর সাহেবদের দ্বারা গ্রামবাংলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে একথা প্রচারের জন্য জনসভার সংগঠনও করেছিলেন।

সত্য সাধনার নিগূঢ় তাৎপর্য তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে কি রূপ পরিগ্রহ করে, বিলাসব্যসন ও বিত্তের সন্ধানে ধাবমান একজন মানুষের সত্যসাধনার অভিজ্ঞতা কি প্রকার, তার আবরণ ভেদ করা তত্ত্বজ্ঞানী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিলাসব্যসন রামমোহনের কিরূপ প্রিয় ছিল তা তার কলকাতার জীবনধারা ও ইংল্যাণ্ডে প্রবাসের প্রথম কয়েক মাসের কাহিনী থেকে জানা যায়। তথাপি, সত্যসাধক বলতে এমন এক ব্যক্তিত্ব মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যা আদর্শের ধ্যানে ও উপলব্ধিতে একনিষ্ঠ, যা বৈষয়িক বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সত্যে ও আদর্শে অবিচল থাকে, যা বৈষয়িক স্বার্থচেতনার কলুষহীন। রামমোহন একেশ্বরবাদ প্রচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন সত্য, কিন্তু উপস্থিত রাজনৈতিক ও সামাজিক সুখসুবিধা, অন্যকথায় বৈষয়িক প্রাপ্তির আশায় হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। এই সুপারিশের মধ্যে বিমল সত্যসাধনা থেকে উপস্থিত প্রাপ্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এই সুপারিশই বোধ করি তাঁর আপন জীবনসাধনারও দ্যোতক। এ বিষয়ে গৃহী-খৃস্টানদের ব্যবহারিক জীবনচর্যার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। খৃস্টীয় ধর্মসাধনার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর এবং ঐশ্বর্যের দেবতা অর্থাৎ গড্ ও ম্যামনকে একই সঙ্গে ভজনা করার মধ্যে কোন বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য নেই। সেইজন্যই ঐশ্বর্যের সন্ধানে প্রমত্ত খৃস্টানদের পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র লুণ্ঠন-অপহরণ-হত্যার সংগঠন ও রবিবারে যথারীতি পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করা সম্ভবপর হয়েছে। সম্ভবত এটাই তাদের পুণ্যপ্রাণ ঐহিকতা বা

holy worldliness-এর আদর্শ। একেশ্বরবাদ ও বিত্তঅর্জন এ দুটি জিনিসের সহাবস্থান রামমোহন-জীবনেও লক্ষণীয়। ইংরেজদের নিকট থেকে রামমোহন জীবনসাধনার এই পাঠ গ্রহণ করেছিলেন কি না কে জানে! অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন।

অসল কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্ন-কল্পনা-অধ্যাসের ঐশ্বর্য দিয়ে এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যিনি বাস্তব সম্পর্ক-বিধৃত মানুষ থেকে স্বতন্ত্র, যিনি ইতিহাসের উর্ধ্বে স্থাপিত এক অতি-মানব। ইংরেজ বিজয় থেকে উদ্‌ভূত সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচিত্র কলরবের মধ্যে শ্রদ্ধায়-অপযশে, সামাজিক কল্যাণ-ব্যক্তিগত স্বার্থে, মুক্তির আস্বাদন-আনুগত্যের বন্ধন, পাপ পুণ্যে মিশ্রিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত যে রামমোহনকে আমরা চিনি, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রামমোহনের সাদৃশ্য যৎসামান্য। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রয়োজন ও সার্থকতা এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যাবতীয় ঘটনা বিচার ও গ্রহণ করার প্রবণতা ও অভ্যাস উত্তর কালের জন্য সৃজন করেছে ইতিহাসের উর্ধ্বে স্থাপিত এই ব্যক্তিত্ব। ফলে, ইতিহাস থেকে ইতিহাস সম্পর্কে কল্পনা, বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তব অসামান্য প্রাধান্য লাভ করেছে। রামমোহন যদি রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসের নায়ক হতেন তাহলে তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা ছিল না; কিন্তু তা নন বলেই সামাজিক-রাষ্ট্রিক সম্পর্কের যথাযথতায় তাঁর মূল্যায়ন কাম্য। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দিক থেকে দুঃখজনক ঐ প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে একটি সতর্কবাণী, সম্ভবত অনিচ্ছাকৃত, উচ্চারিত হয়েছিল; উচ্চারণ করেছিলেন রামমোহন স্মারকগ্রন্থ 'দ্য ফাদার অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। মানুষ রামমোহনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্পণ এবং প্রায় উপপ্লাবী তদ্‌গত মনোভঙ্গির পরিচয় দান করেও তিনি লিখেছিলেন, রামমোহনকে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি রূপে, একটি শিশুবিস্ময় রূপে, শৈশব থেকেই ঋষি-সমতুল, অথবা নিষ্পাপ পুরুষ রূপে উপস্থাপনের চেষ্টা এক দিক থেকে যেমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, অপর দিকে তেমনি তা হবে ইতিহাসের বিকৃতি। রামমোহনের নানাবিধ অসম্পূর্ণতা ছিল, তার অধিকাংশই তাঁর কালেরই ফসল। [The attempt to portray Rammohun as a man apart, as having been an infant prodigy, a saint from childhood up, or as a sinless man, is, therefore, both a futile endeavour and a travesty of history. Rammohun had his limitations, most of

which were the products of the time in which he lived. Part II, P. 511] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রাজ্ঞ নেতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের রামমোহন চরিত্রের নিখুঁত সমালোচনা। আগ্রহের অতিশয়তায় কবি ইতিহাসকে মান্যতা দান করেননি।

সম্প্রতি কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রমেশচন্দ্র মজুমদার রামমোহনের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে সমাজ-সংস্কার, ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার, সহমরণ প্রথার বিলোপ, জাতীয় চেতনার উদ্বোধন, বাংলা গদ্যের রূপান্তর, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁর ভূমিকা পথিকৃতের বলে যে ধারণা প্রচলিত, রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলির যা আন্তর সম্পদ, বিকল্প তথ্যের উপস্থাপনা দ্বারা ড. মজুমদার তা খণ্ডন করায় প্রয়াসী হয়েছেন। তথ্যের অভাব তাঁর নেই, কিন্তু সেই তথ্য ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি ক্ষেত্র-বিশেষে একদেশদর্শিতার পরিচয় দান করেছেন, এবং তাঁর যুক্তির উপস্থাপনায় কখনও কখনও তিনি বিষয়গত নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারেননি। বর্তমান আলোচনা ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হয়েছে, একটি বক্তৃতায় সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সম্ভবও নয়। সেজন্য, যেসব স্থানে ড. মজুমদারের যুক্তি-পারম্পর্য শিথিল বলে বোধ হয়েছে, অথবা ইতিহাসের প্রেক্ষিত বিভ্রান্ত অতএব তাঁর সিদ্ধান্তও বিতর্কিত, আমি শুধু তারই উল্লেখ করব।

রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধি মার্গীয় এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি উপস্থাপন করে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু বেন্টিঙ্ক যখন আইন প্রণয়নের সময় তাঁর পরামর্শ চান তখন তিনি আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেছিলেন। ড. মজুমদার এই ঘটনার উল্লেখ করে ইঙ্গিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রামমোহন ঐ অযৌক্তিক প্রথা উচ্ছেদেরও বিরোধিতা করেছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ তো বটেই, অসূয়ারও দ্যোতক। কারণ, আইন প্রণয়নের বিরোধিতা ঐ প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা বোঝায় না। রামমোহনের আশঙ্কা ছিল, বৃটিশ আইনের জবরদস্তি দ্বারা ভারতীয় সমাজের সংস্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, এবং আশা ছিল যে, শাস্ত্রীয় বিচারে এর অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হলেই এবং তা পণ্ডিত সমাজের অনুমোদন লাভ করলে আইন ব্যতিরেকেই ঐ প্রথা চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক ছিল তাও নয়। তাছাড়া, আইনের সহায়তা ছাড়াই সহমরণে যাবার চেষ্টার বিরুদ্ধে যে পুলিশী তৎপরতা বজায় ছিল, ঐ প্রথার উচ্ছেদে তা

নিঃশব্দে চূড়ান্ত কার্যকর হবে, এ আশাও তিনি করে থাকতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ড. মজুমদার ইতিহাসকে সত্য মর্যাদা দান করেননি। এখানে একটি সমান্তরাল ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্যালেলিও গির্জার পুরুতদের উৎপীড়নে অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তাঁর সৌর-আবর্তের তত্ত্ব অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু, এর তাৎপর্য কি এই যে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আবর্তিত হচ্ছে—এই তত্ত্ব তিনি মেনে নিয়েছিলেন? তাছাড়া, সহমরণ নিষিদ্ধ করে আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর মুহূর্তেই যাঁরা বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন অগ্রণী।

রামমোহন উচ্চ বর্ণের হিন্দু বিধবাদের বিবাহে আপত্তি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং মদ্যপানের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় সম্মতি পেশ করেছিলেন। ড. মজুমদার এসব ঘটনাকে তাঁর প্রগতিশীলতা-বিরোধী মনোভঙ্গির পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। এও ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা নয়। কারণ, যে কোন কালে যে কোন কালের অথবা সর্বকালের সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করা যুক্তিবিচারে অসিদ্ধ। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাল তার একান্ত আপন ভাবনায়ই সেই ক্ষণের মানুষকে সচেতন করে। সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল বলে উচ্চ কোটির হিন্দু বিধবাদের পুন-বিবাহের প্রশ্ন রামমোহনের যুগে উচ্চারিত হয়নি, হওয়ার সামাজিক মানসিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়নি। সব বিধবাই সহ-মৃত্যু বরণ করত না, তথাপি নীতিগত-ভাবে বিধবাদের সম্মানসহ বেঁচে-থাকার মানবিক অধিকার স্বীকৃত হলেই তবে তাদের বিবাহের প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে, তার পূর্বে নয়। সহমরণ রহিত হওয়ার পর তাদের বাঁচার অধিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি লাভ করে, এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবেই বিদ্যাসাগরের যুগে বিধবা বিবাহের আন্দোলন সংগঠিত হয়। সুতরাং, বিধবা বিবাহ সর্বত্র "অব্যবহার্য", প্রচলিত এই বিশ্বাসের পুনরুক্তি করায় রামমোহনের প্রগতিশীল ভূমিকা বিনষ্ট, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন ইতিহাসবিদের নিকট আদৌ প্রত্যাশিত নয়।

তেমনি প্রত্যাশিত নয় অবমূল্যায়নের প্রচ্ছন্ন চেষ্টা। রামমোহন সম্পর্কিত ড. মজুমদারের ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলে এমনি একটা ধারণা পাঠকচিত্তে বদ্ধমূল হয়। দেখা যায়, তিনি সুবিধামত বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সাক্ষ্য। ভিত্তি করে রামমোহনের ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, কোন একটি যুগের আন্তর বৈশিষ্ট্য অথবা সামাজিক প্রবাহকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করার পক্ষে একজন নায়ক চরিত্রের অসম্পূর্ণতার প্রতি

আলোকপাত বিশেষ সহায়ক হয় না; বরং তা বিশ্লেষকের মাৎসর্য বলে গৃহীত হবার আশঙ্কা। তেমনি একটি নীলকরদের সমর্থনের জন্য রামমোহনের বিরুদ্ধে ড. মজুমদারের বিদ্রূপ। কেন সমর্থন করেছিলেন, তার বিষয়গত কার্যকারণ বিশ্লেষণই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব; বিদ্রূপ বিষয়গত নির্লিপ্ততার সীমা লঙ্ঘন করে।

উত্তরকালের নিকট রামমোহনের মূল্যায়নের সমস্যা ঠিক এরূপ নয়। আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তা-মনন-কর্মের যা কিছু ঐশ্বর্যশীল অভিব্যক্তি তা সব কিছুর উৎস রামমোহন, এ ধরনের যুক্তিহীন মানসিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি অবশ্যই কাম্য; যেমন কাম্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী উচ্চারিত বিভ্রান্তি অর্থাৎ তাঁকে স্থান কাল সম্পর্কের স্পর্শাতীত অতি-মানব রূপে গ্রহণ করার মনোভঙ্গি থেকে মুক্তি। প্রত্যেক মানুষই নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের ফসল। সেই সম্পর্কের নির্দিষ্টতার মধ্যে তাকে স্থাপন করে এবং তার সৃজ্যমান পরিবেশকে জীবন্ত করে এরই পটভূমিতে তার চিন্তামনন ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করলেই পূর্ব-কথিত বিভ্রান্তি এবং সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী অস্বীকৃতির অনৈতিহাসিকতা থেকে বিশ্লেষণকে বিমুক্ত রাখা সম্ভবপর। এই দৃষ্টিমার্গ অবলম্বন করেই আমরা পূর্ব আলোচনায় রামমোহনের বুদ্ধিজীবী ভূমিকা ও রাজনৈতিক মতামত বিশ্লেষণ করেছি। ঐ বিচারে নির্মোহ সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করি। এবং সমাজ প্রবাহে তাঁর অবদানের অনন্যতা কোথায় তাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

উপসংহারে তা পুনরায় স্মরণ করা যাক। বুদ্ধিমার্গীয় ভাবনার অনুশীলন থেকে যে রামমোহন আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছিলেন তা সুনিশ্চিত। তাঁর অনেক কর্ম ও উক্তির পশ্চাতে বৈষয়িক চেতনার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐ কালে উদ্ভিন্ন মহৎ ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেরেছিলেন। মন চলাচল ও মানসিক ব্যাপ্তির তা এক বিরল দৃষ্টান্ত, অন্তত তৎকালীন পরিবেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ও বিশ্বমানবের রাষ্ট্রীয় সাধনার এমন এক বিবর্তন তাঁর চেতনায় বিমূর্ত স্পন্দন সঞ্চার করেছিল, যেখানে বিরোধ নয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হবে। মানবিক ইতিহাসে বিমূর্ত ভাবনার অবদানও সামান্য নয়। আর তাঁর প্রথম রচনা 'তুহ্ ফত্'-এ যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিআশ্রয়ী মননের স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তা সমকালীন অন্যান্য মানুষের চিন্তায় অনুপস্থিত। যুক্তিবাদী মননশীলতায় তিনি স্বয়ং সর্বদা অবিচল থাকুন বা না থাকুন, তাঁর এবংবিধ আত্মপ্রকাশ থেকে

সৃষ্ট হয় এক নতুন বিচার পদ্ধতির, এক নতুন ঐতিহ্যের। এক্ষেত্রে তাঁর কালের অন্য কোন বাঙালীর অবদান বিশেষ গ্রাহ্য নয়। আর, একথাও অনস্বীকার্য যে, তাঁর যুক্তিবাদী ঐতিহ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।